অয়স্কান্ত

নন্দ চৌধুরী

ক্লাসিক প্রকাশনী
ব্লক নং ৫, স্টল নং ৩১
বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রকাশক

ঈশ্বর দত্ত

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ

১লা আশ্বিন ১৩৬৮, ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৬১

প্রচ্ছদ

দিলীপ মুখোপাধ্যায়

মুদ্রক

প্রভাসচন্দ্র অধিকারী

স্বপ্না প্রেস

৩৫/২/১-এ বিডন স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০০৬

ভূমিকা

আমাদের বাংলা ছোটগল্পের জগৎ বহুদিন পর্যন্ত উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল, তার ভিতর অন্য সমাজের প্রভাব তেমন পড়েনি। অন্য সমাজ, অন্য পরিবেশ, অন্য মানুষ—এসব বাংলা ছোটগল্পের দর্পনে খুব অল্পই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বাংলা ছোটগল্প হয় ছিল গ্রামকেন্দ্রিক, নয় তো নগর কেন্দ্রিক। গ্রামকেন্দ্রিক গল্পগুলির চিত্র-চরিত্রের রূপায়ণে দু রকম সমাজের প্রতিফলন হয়েছে—ভূমি-ব্যবস্থার আওতায় পালিত জমিদার, জোতদার, তালুকদার, প্রভৃতি শ্রেণীর সমাজ-পরিমণ্ডল, অথবা গ্রামীন মধ্য ও নিম্নবিত্ত সাধারণ মানুষের গার্হস্থ্য সুখদুঃখমণ্ডিত আটপৌরে সংসার যাত্রার ছবি। এই দুই শ্রেণীর পরিধির বাইরেকার নিবিত্ত চাষী কিংবা ভূমিহীন নিঃস্বদের কথা খুব কম গ্রামের গল্পেই চিত্রিত হয়েছে। অন্য পক্ষে শহরের গল্পে হয় প্রাধান্য পেয়েছে উচ্চশিক্ষিত বিত্ত সচ্ছল অভিজাত ও ধনী পরিবারগুলির কথা, নয় তো বড় হয়ে উঠেছে সাধারণ শিক্ষিত বিভিন্ন বৃত্তিজীবী মধ্য বা নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষদের বিচিত্র আশা-আকাঙ্খা স্বপ্ন কামনা অভাব অভিযোগ সমন্বিত জীবনে বেঁচে থাকার সংগ্রামের কথা। এখানেও, এই দুই সম্প্রদায়ের বলয়ের বাইরে যে খেটে খাওয়া মেহনতী স্তরের মানুষের একটা প্রকাণ্ড সমাজ পড়ে রয়েছে—কারখানার শ্রমজীবী সমাজ অথবা নানা ধরনের দৈহিক খাটুনির কাজে নিযুক্ত থেকে দৈনন্দিন রুজি-রোজগারের দ্বারা আপনজনদের প্রতিপালনকারী সমাজ—তাদের জীবন বাংলা ছোটগল্পে সামান্যই রূপ পেয়েছে। ইদানীং অবশ্য বিষয়বস্তুর বৃত্তের সম্প্রসারণ ঘটছে, তবে বড়ই ধীরগতিতে, এই শিল্পায়িতকরণের যুগে যত দ্রুতবেগে ও ব্যাপকভাবে প্রত্যাশা করা গিয়েছিল তেমনটা ঘটছে না। এটা বাংলা ছোটগল্পের একটা দৈন্য সে কথা মানতেই হবে।

তবে আশার কথা এই যে, পশ্চিমবাংলার সমাজস্থিতি আর এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। স্বাধীনতার পর থেকে তার জনসংখ্যার বিন্যাসের ছকে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এ রাজ্যের মানচিত্রের হয়ত বদল হচ্ছে না, কিন্তু মানচিত্রের স্থানে স্থানে নতুন বিন্দুর মত কতকগুলি নতুন জনপদ গড়ে উঠছে, যাদের কর্ম-কাণ্ড ও জীবনরীতি একটু অন্য প্রকারের। এই সব কয়টি জনপদই আধুনিক পরিভাষায় আমরা যাকে 'শিল্প-নগর' বা 'শিল্প শহর' বলি, তার কোঠায় পড়ে। ভারী বছরের শিল্পায়িতকরণের প্রয়াসের সঙ্গে এই জনপদগুলির নিবিড় যোগ এবং তারই ছাচে এই সব জায়গার ল্যাণ্ডস্কেপ বা নিসর্গ বৈশিষ্ট্য, প্রতিবেশ, মানুষ

ও তাদের জীবনযাত্রার প্রণালী, জনবিন্যাস ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। এরূপ প্রতিটি শহরেই কারখানার উন্নতশীর্ষ চিমনিশ্রেণী থেকে ওই শহরের প্রকৃতি বোঝা যায়। আকাশের পটে বিলম্বিত নিয়ত কৃষ্ণধূম উদ্গীরণকারী সমুচ্চ চিমনি অথবা কারখানার অভ্যন্তরে রক্তলাল গনগনে আগুনের ব্লাস্ট ফার্ণেস—এই সব শহরের কুলচিহ্ন বললেও চলে।

এ রাজ্যের তেমন কয়েকটি শহর হলো—চিত্তরঞ্জন, বার্ণপুর, কুলটি, রূপনারায়নপুর, বরাকর, রাণীগঞ্জ, অণ্ডাল, ওয়ারিয়া, কাঁচরাপাড়া এবং অবশ্যই—দুর্গাপুর। এই শহরগুলির নয়া ধরনের আবেষ্টনী ও জনবিন্যাস পশ্চিম-বাংলার সমাজস্থিতিতে একটি নতুন আয়তন যোগ করেছে, যার সঙ্গে আগে আমাদের কখনও পরিচয় ঘটেনি। সমাজেও নয়, সাহিত্যেও নয়। ভূগোলেই যার অস্তিত্ব ছিল না, সাহিত্য তার পবিচয় কেমন করে পাওয়া যেতে পারে? কথাসাহিত্যের আধারে শিল্প শহরের ইতিবৃত্তকথা বাংলা উপন্যাসে ও ছোটগল্পে অতি-সাম্প্রতিক সংযোজন। এই নূতন সংযোজনার ফলে বাংলা কথাসাহিত্যের এতাবৎ অত্যন্ত অতি-পরিচিত গতানুগতিক ছাঁচেব যে দৃষ্টিগ্রাহ্য বিস্তার ঘটেছে সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই। অন্ততঃ বাংলা ছোটগল্পে এই পরিবেশের বদল খুব প্রকটভাবে অনুভব করতে পারছি।

ধরা যাক, এই গল্প সংগ্রহের গল্পগুলি। একেবারেই নতুন পরিবেশের, নতুন ধাঁচের, নতুন স্বাদের। এই সব অভিনব বৈশিষ্ট্যের কোন পূর্ব-নজীরের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ছিল না। সব কয়টি গল্পই শিল্প শহরের পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে এবং গল্পের কোথাও উল্লেখ না থাকলেও অনুমান করি দুর্গাপুর শিল্প-নগরীর পটভূমিই সেগুলির আশ্রয়। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, শ্রীযুক্ত নন্দ চৌধুরী, যিনি এই গল্পগুলির লেখক তিনি দুর্গাপুরের শিল্পনির্মাণ কর্মের সঙ্গে জীবিকার যোগে যুক্ত। বৃত্তিতে ইস্পাতঘটিত প্রযুক্তি বিদ্যার ট্রেনিং প্রাপ্ত টেকনিশিয়ান্। এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি গল্পের মধ্যে তাই স্বভাবতই তাঁর প্রত্যক্ষ জীবন-অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতির প্রভাব এসে পড়েছে। প্রতিটি গল্পই বলতে গেলে কম বা বেশী পরিমাণে কারখানাভিত্তিক জীবনের অবলম্বনে রচিত। এ জিনিস বাংলা ছোটগল্পে আগে দেখিনি, এ একেবারেই আমাদের মাতৃভাষায় সম্পূর্ণ নবীন ঐতিহ্য বয়ে নিয়ে এসেছে। একই সঙ্গে এর দ্বারা বাংলা গল্পের ভূগোলের ও ইতিহাসের স্পষ্টগ্রাহ্য সীমানাবিস্তৃতি ঘটেছে।

নন্দ চৌধুরী তরুণ প্রজন্মের প্রগতিশীল ছোটগল্প লেখকদের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট এক ছোটগল্প লেখক। তাঁর বহু সংখ্যক ছোটগল্প ইতঃপূর্বে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে রসজ্ঞ পাঠকের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। সুধী সমালোচকবৃন্দও তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্যে চকিত হয়েছেন। চকিত হওয়ার কারণ এই লেখক সর্বদাই অগ্রসর চিন্তাচেতনার ধারাবাহী ঐতিহ্যের অনুগামী হয়ে গল্প লেখেন, কখনও মধ্যবিত্ত জীবন সুলভ সস্তা রোমান্টিক প্রেমের গল্প লেখেন না ত্রিকোণ প্রেমের ধরতাই গল্প তো আদপেই নয়, সর্বোপরি তাঁর গল্পের পরিবেশিত চিত্র-চরিত্র সবই তাঁর স্বকীয় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে চয়িত। এই শেষোক্ত বৈশিষ্ট্যটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। কেননা এটি তাঁর লেখায় এক অনন্য সত্যনিষ্ঠার স্বাদ এনে দিয়েছে, যা গল্পকারদের রচনায় সচরাচর দুর্লভ। লেখক কোন প্রলোভনেই নিজের সাক্ষাৎ দেখা ও চেনা জগতের বৃত্তের বাইরে যাননি।—এতে লেখকের একালীন সত্যানুরাগ, সংযম ও নম্রতার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে।

নন্দ চৌধুরী একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক। তাঁর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি বিষয়ক কৌতূহলও নানা মুখী। কারখানায় কাজ করলেও তাঁর মনটি পরিশীলিত সাংস্কৃতিক সুরুচির কর্ষণা যুক্ত। তাই যদি হয় তবে কেন তিনি নিছক কারখানাভিত্তিক গল্পই লিখলেন এই সংগ্রহের গল্পগুলিতে? আর তাও কেবলমাত্র দুর্গাপুর শিল্প শহরের পরিমণ্ডলকে অবলম্বন করে? কেন তিনি ভুলেও অন্য ধরণের কোন বিষয়বস্তুতে আকৃষ্ট হলেন না? এটা কি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর সীমাবদ্ধতার পরিচায়ক? অথবা তাঁর আপেক্ষিক কাল্পনিক দৈন্যের হেতু?

মোটেই তা নয়। গল্পগুলির মধ্যে তিনি অবাস্তব কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে চাননি বলেই স্বেচ্ছায় তিনি আপনার শিল্পের পরিসরকে সীমিত আয়তনের ভিতর সংকুচিত করে এনেছেন। আর ফোটাতে চেয়েছেন শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত কর্মীদের শোষণ ও অবদমনের বিরুদ্ধে বাঁচার লড়াইয়ের আকুতি। অবশ্য শ্রেণীবিভক্ত সমাজে মালিক ও শ্রমিকের মধ্যে অহর্নিশ যে আপোষহীন শ্রেণী সংগ্রামের দ্বন্দ্ব চলেছে তার সর্বাত্মক আলেখ্য হয়ত এই গল্পগুলির মধ্যে পাওয়া যাবে না, তবে ব্যক্তিগত স্তরে শ্রেণীশোষণের নির্মমতার ও অবিচারের

একাধিক টুকরো ছবি গল্পগুলির মধ্যে খুব শিল্পনিপুণ ভাবেই পরিবেশন করা হয়েছে, সে লক্ষণ স্পষ্ট।

বইয়ের প্রথম গল্প 'অষ্টম সন্তান' প্রাচীন পুরাণ-কাহিনীর রূপকে নির্মম শ্রেণী-শোষণের এক প্রশংসনীয় শিল্পকর্ম। 'মিঃ মেহতা' গল্পে একজন অফিসারের বিবেকবত্তার রূপটি বড় চমৎকার ফুটেছে। 'শিক্ষানবিশ' গল্পটি কারখানা-কেন্দ্রিক কর্মধারায় নবীন শিক্ষাকর্মীর অযথা অন্যায়ের বলি হওয়ার একটি করুণ কাহিনী। 'মানুষ, মানুষ' সংগ্রহের একটি শ্রেষ্ঠ গল্প। মধ্যবিত্ত সংসারে বেকার জীবনের অসহায়তা যে কোন পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে তার একটি নির্মম চিত্র। লেখকের প্রদর্শিত সমাধানের ইঙ্গিতটিও রীতিমত বলিষ্ঠ ও সংস্কারমুক্ত। আরেকটি উৎকৃষ্ট গল্প 'শোক মিছিল'। একই সংগ্রামী আদর্শের পতাকাবাহী অথচ পরস্পর বিবদমান দুই ইউনিয়নের নেতা ও কর্মীবৃন্দ একটি শোকমিছিলকে কেন্দ্র করে কেমন করে তাদের দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটিয়ে নিতে পারলো তার গঠনমূলক ইঙ্গিতে গল্পটি শুধু শিল্পগুণান্বিতই হয়নি, কল্যাণপ্রদ শ্রমিক ঐক্যের সারবান বার্তাও বয়ে নিয়ে এসেছে। আততায়ীর হস্তে বিপক্ষদলীয় কমরেডের হত্যা দুই বিরোধী ইউনিয়নের মিলনের কারণ হয়ে গল্পটির উপর একটা গভীর কারুণ্যের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়েছে। 'ইস্পাতের ফসিল' গল্পটির শিল্পচাতুর্যের জন্য লেখককে বারবার সাধুবাদ জানাব। এমন শিল্পনিপুণ গল্প বোধহয় এই সংগ্রহে আর একটিও নেই, যদিও এর বিষয়বস্তুর মূল্য সামান্যই। সর্বশেষ গল্প 'একটি না লেখা গল্পের ভূমিকা' সবশেষে সংস্থাপিত হলেও এতে খুব কৌশলে একটি বড় বক্তব্যকে তুলে ধরা হয়েছে—মানুষের আত্মসম্মানের বক্তব্য। কেমন করে আত্মসম্মান বহন ও রক্ষা করতে হয় এই গল্পে তার ইঙ্গিত ও সংকেত ধরে দেওয়া হয়েছে

মোটকথা, নন্দ চৌধুরীর এই প্রথম গল্পের বই খুবই সুলিখিত ও উপাদেয় হয়েছে। আমি লেখককে গ্রন্থকার জগতে আন্তরিক স্বাগত জানাই ও তাঁর উত্তরোত্তর শিল্প-সাফল্য কামনা করি। পাঠক সমাজে বইটির যথোচিত সমাদর হবে নিঃসন্দেহে।

নারায়ণ চৌধুরী

বেলা-কে

গ ল্প ক্র ম

অষ্টম সন্তান

নিঃঝুম মাঝরাত।

সমস্ত পৃথিবী ঘুমোচ্ছে একটা শুকজরে ভিজে কালো কম্বল মুড়ি দিয়ে। সোঁ। সোঁ। করে তীরের মত তীব্র বাতাস বইছিল একটু আগেও। এই মুহূর্তে তাও বন্ধ। সবাই যেন কান পেতে গম্ভীর হয়ে বসে আছে কিছু একটা শোনার আশায়। কিছু যেন একটা ঘটবে।

নিভু নিভু হয়েও কোন রকমে বারবার বেঁচে উঠছে কেরোসিনের ডিবরীর লাল শিখাটা। কালো কালো ধোঁয়া ওগরাচ্ছে। তালপাতায় ছাওয়া ঝুপড়িটার চাল থেকে এখনো টপ্ টপ্ করে বড় বড় ফোঁটা পড়ছে তোবড়ানো একটা টিনের থালায়।

অবিনাশ হাত দুটো হাঁটুর দু পাশে বেড় দিয়ে নিঃশব্দে বসে ছিল। না ঘুম নেই তার চোখে। প্রকৃতির এই খামখেয়াল নতুন নতুন অর্থ নিয়ে আসছিল তার কাছে। দমকে দমকে একটা ভয় আর ক্লান্তির পাকানো স্রোত শির শির করে উঠানামা করছে দড়ির মত শুকনো তার শরীরে।

সামান্য দূরে, ঝুপড়ির ভিজে মাটির মেঝের ঠিক মাঝখানটিতে ছেঁড়া চট আর রাজ্যের ছেঁড়া ন্যাকড়ার গাদার উপর বাসিনী পড়ে আছে। কোমরের কাছে স্ফীত অংশটাকে ম্লান আলোয় মনে হচ্ছে একটা বালির ঢিবির মত। সরু সরু কাঠির মত হাত দুটো খিমচে ধরে আছে শুকনো আর ফ্যাকাশে দুটো জানু। মুখটা অসম্ভব সাদা আর সরু—নাকটা পাতলা একটা তিনকোণা ছুরির মত দুটো কোটরগত চোখের মাঝখানটিতে বসানো। দেখে বোঝাই যায় না, এ সেই বাসিনী—দশ বছর আগেও যাকে পাবার জন্য সুপারভাইজার তো কোন ছার, বাবুরা তক পাগল হত।

সে একটা দিন ছিল। স্বপ্নের মত। অবিনাশ এখনো চোখ বুজলেই দেখতে পায় দশ পনের বছর আগেকার সেই দিনগুলো। দামোদরের সারা উত্তর পাড়টা জুড়ে কাজের সে কী মাতন। বড় বড় যন্ত্রপাতি বোঝাই ট্রাক আর ট্রেলার আসছে যাচ্ছে যখন তখন। কাঁচা রাস্তায় উড়ছে ছাতুর মত মিহি ধুলো। এদিকে চলছে জঙ্গল কাটা। বড় বড় কতদিনের পুরোন গাছ,

দালান কোঠা, ঠাকুর বাড়ী সব ছিন্নভিন্ন হয়ে মাটিতে মিশে যাচ্ছে নিঃশেষে বুলডোজারের করাল দাঁতের আঘাতে। বড় মোটা শাল গাছের খুঁটির মাথায় মাথায় টানা হয়েছে ইলেকটিরি তার। সারা রাত চকচকে আলো জায়গাটাকে একেবারে দিনের মত করে রাখে। কাজ চলছে দিনেরাতে। এখানে ওখানে ভট্ ভট্ আওয়াজ করে চলছে মিক্সার। তার উপরে দেওয়া মশলা শানকিতে শানকিতে মাথায় বয়ে নিয়ে চলছে কামিনরা।

দেখতে দেখতে মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে এক একটা সেতু, কারখানার ভিত, টাউনশীপের কোয়ার্টার, হাসপাতাল, বাজার।

দুর্গাপুরের কলকারখানার রাজ্যি গড়ে উঠছে একটু একটু করে। এধার ওধারের দশখানা গ্রাম ঝেঁটিয়ে উঠে গেছে গবরমেণ্টের নোটিশ পেয়ে। একটা মাটির খোড়ো বাড়ী আর তিন বিঘে ধানী জমির কমপেনসেসনের টাকা ট্যাঁকে গুঁজে অবিনাশও অনেকের দেখাদেখি লাইন দিল কনট্রাকটরের কুলি ভর্তির আপিসে। কাজের ভাবনা নেই তখন। ডেকে ডেকে চাকরী দেয়। থাকারও জায়গা হয়ে গেল কুলি ধাওড়াতে। সাইটের কাছেই একটা মাঠে থাক থাক ইট সাজিয়ে উপরে হোগলার চাল আর বাঁশের মতুন বেঁধে তৈরী হয়েছে খুপরীর পর খুপরী। একপাশে পুরুষদের অন্য পাশে মেয়েদের। অবশ্য ব্যবধানটা নেহাতই পলকা। রাতের অন্ধকার নামলে, যখন ধেনো আর মহুয়ার গন্ধ বাতাসে ভুরভুর করে, পা টলে বেমতলব, তখন কে যে কোথায় চুপিসারে ঢুকে পড়ে তা দেখার জন্য কেউ বসে থাকে না। দেখে ফেললেও কেউ মাথা ঘামায় না এসব ছুটকো ব্যাপার নিয়ে।

এগুলো খবর হয় না। তা বলে ব্যতিক্রম যে একেবারে ছিল না তা নয়। বাসিনীও থাকত ধাওড়াতেই। একেবারে কোণ ঘেঁসে একটেরে একটা খুপরী। সঙ্গে থাকত দূর সম্পর্কের কে একটা বুড়ি। বাসিনী ডাকত মাসী। বুড়ী তার ছানিপড়া চোখ আর ঢিলে চামড়া নিয়ে ঘর আগলাত, রান্না-বান্না করত। সেবা শুশ্রূষা করত বাসিনীর অসুখে বিসুখে। আর বাসিনী কামিনের কাজ করত নামেই—তার আসল কাজ শুরু হোত রাত্রির অন্ধকার নামলে। বড় বড় গাড়ী লাইট নিবিয়ে দাঁড়াত এসে বিরাট কুসুম গাছটার তলায়। বাসিনীকে তুলে নিয়ে হুসহাস চলে যেত তেমনি অন্ধকারেই। সেটা হোত খবর। কার গাড়ী, কত বড় গাড়ী, কত পেল বাসিনা এসব নিয়ে গবেষণার অন্ত ছিল না। বাসিনীর ফুরফুরে ফর্সা চোখা চেহারাটা দেখে কোন সাহেব কি বলেছে এটা জানার জন্য সম-বয়সীরা বাসিনীকে তোয়াজের আর কিছু বাকী রাখত না।

হঠাৎ আঁ-আঁ করে চিৎকার করে কাটা ছাগলের মত বাসিনী হাত পা ছুঁড়তে লাগল। অমনি চোখের ঘোর কেটে গেল চড়াক করে অবিনাশের। বোকার মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল সে ফ্যালফ্যাল চোখে, তারপর উঠে ধীরে ধীরে বাসিনীর মাথার কাছে গেল। ছেঁড়া কাপড়কানিগুলো সব ভিজে উ:ঠছে ততক্ষণে। অন্য অন্যবার এই সময়টায় মিস্তিরির বিধবা বুনটা থাকে। সে সব জানে টানে। অবিনাশ শুধু বাইরে বসে বসে বিড়ি টানত। ভেতরে যেতে দিত না তাকে। বাচ্চা হলে 'নাই' কেটে হাতটাত ধোয়া হলে তবে ভেতরে যেতে অনুমতি মিলত তাব। তারপর সেঁকতাপ দেওয়া বা বালি করে দেওয়া এসব অবশ্য অবিনাশও করে দিয়েছে অনেকবার, কিন্তু এই সময়টা—জীব সৃষ্টির এই অনন্ত রহস্যের ব্যাপারগুলো সম্পর্কে তার কোন ধারণা নেই। মিস্তিরির বুনকে এবার তো ডাকা চলবে না—ব্যাপারটা লোক জানাজানি হোক এটা ওরা কেউ চায় না। না অবিনাশ, না বাসিনী। তাতে অসুবিধা অনেক। অবিনাশ অসহায়েব মত আরো কিছু ছেঁড়া কাপড় খুঁজল চাপা দেওয়ার জন্য। না পেয়ে ফেব বাসিনাব কাছে এসে উদ্বেগঝরা গলায় ডাকল 'এ বাসি, বাসি'।

সাডা দেবাব অবস্থা নেই তখন বাসিনীর। সাবা শরীরের চাপা ব্যথাটা সামাল দিতে সে তখন আছাড়ি পিছাড়ি খাচ্ছে। একটা চাপা গোঙানির মত শব্দে কেঁপে কেঁপে উঠছে তার পাতলা নীল ঠোঁট দুটো। অবিনাশ জিভ দিয়ে নিজের শুকনো ঠোঁট চাটল।

আর সেই মুহূর্তে অবিনাশের চোখের সামনে আবার ভেসে উঠল সেই বিরাট বড বাড়ীটা। সার সার জানালায় ঝোলানো কাপড, গামছা, ঘরটার সামনে দাঁড়ালেও যেন ওষুধের ঝাঁজ নাকে লাগে। অবিনাশদের সঙ্গে এই বাড়িটাব পরিচয় আরো আগের। যখন নতুন পয়েন্ট করা চাতালটাব মাঝখানে ভটভট করে মিক্সার চলত, সুপারভাইজারটা ছুটোছুটি করত নক্সাআঁকা কাগজ হাতে তখন থেকে। বাসিনী তখন কামিন। শানকিতে মসলা বয় মাথায়। অবিনাশ কুলিদের 'ম্যাট'। মিক্সাবে গুনে গুনে বালি সিমেন্ট আর খোয়া ঢালে। পরিমাণ মত জল মেশায়। মশলা তৈরী হয়ে গেলে ঢেলে ফেলে মিক্সাবের পেট থেকে, তারপর কামিনদেব শানকিতে শানকিতে ভরে দেয় বেলচাতে করে।

বলতে গেলে বাসিনীর সঙ্গে অবিনাশের মুখোমুখি পরিচয় এইখানেই। অবিনাশের শক্তপোক্ত পেটাই চেহারা, হাতে-পায়ে মাংসপেশীর ছড়াছড়ি, দেড়শ দু'শ যত মজুর কাজ করে সকলের সে সর্দার। আর বাসিনী নামেই কামিন,

আসলে মোটামোটা কব্জি, আর লাল লোমওয়ালা সুপারভাইজারটার পেয়ারের লোক। তার ঘরে বাসিনীর নিত্যি আসা-যাওয়া। বাসিনী সাইটে আছে—ইচ্ছে হলে কাজ করে, ইচ্ছে না হলে বসে থাকে, ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায় এর-তার সঙ্গে। খেলাচ্ছলে সে যদি কারো মাথায় সিমেণ্ট গোলাও ঢেলে দেয় নিজেকে ধন্য জ্ঞান করে সে।

তারপর, তারপর কণ্ট্রাক্টার কোম্পানির কাজের তখন শেষ পর্যায়। হাসপাতালের সেই বিরাট বিল্ডিংটার চারতলার ছাদে ঢালাই চলছে। কোম্পানী নতুন অর্ডার পেয়েছে বিশাখাপত্তনমে। তাদের যন্ত্রপাতি কিছু কিছু রওনা দিয়েছে সেখানে, সেই লাল লোমওয়ালা সুপারভাইজারটা চলে গেছে সেখানের কাজে। আর সেই সময়ই হঠাৎ পরপর দুদিন বাসিনী এল না কাজে।

বাসিনীর কাজে না আসাটা তেমন নতুন কিছু নয়। কিন্তু তৃতীয় দিনে অবিনাশকে একলা পেয়ে একটা কামিন যখন ফিসফিস করে তাকে জানাল, 'ওহে লাগর, তুমাকে একবার ডেকেছে বাসিনী,' তখন অবিনাশ রীতিমত বিস্মিত হয়েছিল।

'—কী হয়েছে তার? দু দিন নাগা কেনে?

—মেয়েটার খুব ওসুখ গ, জ্বরের ঘোরে ভুল বকছে।'

সত্যিকথা বলতে কি এত লোক থাকতে তাকেই ডাকল বলে, অবিনাশের বুকটা গর্বে ফুলে উঠেছিল, সেদিনই সন্ধ্যাবেলায় আধ পোয়াটাক মিছরি নিয়ে হাজির হোল সে বাসিনীর ঝুপড়িতে।

কণ্ট্রাক্টরের কাজ বাসিনীর সেই শেষ। বিছানায় সেই যে পড়েছিল, এক মাসের আগে আর উঠতে হোল না। জ্বর সারল বটে কিন্তু শরীর খুব কাহিল। তার উপর মুখে-বুকে লাল-লাল চাকা-চাকা কি রকম যেন ঘা হয়েছে। এক-মাথা ঝমঝমে কালো চুল উঠতে উঠতে মাথায় টাক পড়ার জোগাড়। বাসিনী, একমাস আগেকার সেই লকলকে গর্বিতা সাপিনী, অবিনাশের দুটো হাত ধরে কাঁদতে লাগল ঝরঝর করে।

'আমাদের কি হবেক গো? কুথাকে যাব আমরা?'

অবিনাশ বিজ্ঞের মত ঘাড় নেড়ে চিন্তিত স্বরে বলেছিল, 'তাই তো, টাকাকড়ি কিছুই রাখ নাই? তখন তো –'

টাকাকড়ি জমানোর অবস্থা যে কুলি কামিনদের হয় না তা ভালোই জানা অবিনাশের। কিন্তু বাসিনীর কথা আলাদা, তার ঘরে গাড়ীর পর গাড়ী ধরনা দিত। ইঙ্গিতটা সেই নিয়েই।

কিন্তু না, কিছুই জমাতে পারেনি বাসিনী, তার সে স্বভাবই নয়। সুযোগ বুঝে মাসি পর্যন্ত ফোঁস করে ওঠে—

—বাসিটা বড় বকা গ, বুইঝল নাই, উয়ারা সব সুখের পায়রা গ—দুখের সময় কেউ লয়।

বাসিনীর সেই ভুলের মাশুল গোনা আজও শেষ হয় নি, এব আগে সাত-সাতটি সন্তানেব জন্ম দিয়েছে সে। প্রথম দুটি বেঁচেছিল দু'এক মাস। বাকী পাঁচটির জন্ম হয়েছে অসময়ে, হাত-পা গজায়নি কিছুই, শুধু রক্তের ডেলা। সাতটি সন্তানেব জন্ম দিতে গিয়ে বাসিনীর জ্বলে গেছে সোনার মত রঙ, মাজা গেছে বেঁকে। দুর্গাপুরে বাবুদের কোয়ার্টাবে এখন ঝিয়ের কাজ কবে সে। কণ্ট্রাক্টবেব কাজ চলে যাবার পর কুলি ধাওড়াব আশ্রয়টা যায় তাদেব। তখন বাসিনীকে নিয়ে অবিনাশ দুর্গাপুরের ডাঙ্গায় উঠল এসে একটা ঝুপড়ি বানিয়ে। কোম্পানী উঠে যাবাব সময় সবাইকে দিয়েছিল দু'হপ্তার মাইনে, আর একটি কবে সার্টিফিকেট। ঘব আব জমির টাকায় অবিনাশ কিনেছিল রেডিও আর হাতঘড়ি। সে সব বিক্রি কবে তাদেব চলল কিছুদিন। তাবপর অবিনাশ লেগে গেল রিক্সা চালানোর কাজে। কাবখানায় তখন নতুন লোক নিচ্ছে অনেক। অবিনাশও ঘোরাঘুরি কবেছিল কিছুদিন। কিন্তু লোক নেবাব রহস্যটা যে কি, তা আজও ভেদ কবতে পারেনি।

হাসপাতালে এখনও যেতে হয় অবিনাশকে যখন তখন। আসন্ন প্রসূতি কিংবা কোন রুগ্ন ফ্যাকাশে শিশুকে নিয়ে। রিক্সা টানতে টানতে মুখের দিকে না তাকিয়েও বুঝতে পারে সে সঙ্গের সুস্থ লোকটির উদ্বেগ। হয়তো বাবা হয়তো বা স্বামী। উত্তেজনায় দ্রুত চাপ পড়ে প্যাডেলের উপব। পিছন থেকে নাতি-উচ্চস্বরে হুঁসিয়ারী দেয় সুস্থলোক—'সামহালকে।'

সামলানো কি যায়! হাসপাতালের বিবাট গেটটার সামনে রিক্সা ভিড়িয়ে দিয়ে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে অবিনাশ শূণ্য চোখে। সুস্থলোক প্রথমে নিজে নামে, ব্যাগ খুলে পয়সা দেয়। তাবপব রুগীকে ধীরে নামিয়ে নিয়ে বাড়িটার ভেতর ঢুকে যায়। অবিনাশও ঢোকে একটু পরে। ধীরে ধীরে টিকিট কাউণ্টারটারেব সামনে দাঁড়ায়। কত লোক! যেন মেলা বসে গেছে। সার সার ঘর। ঘরের সামনে কাঠের পাটায় ডাক্তারের নাম লেখা। অবিনাশ জানে এক একটা ঘর এক এক রকম চিকিৎসার। কোনটা চোখের—কোনটা কানের—কোনটা কাটা-ছেঁড়ার। বাচ্চা হওয়ার ঘর আরো ওদিকে—একটেরে, মস্ত বড় কাঁচ লাগানো দরজার ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখেছে সে, এক একটা

বিছানায় এক একটি লাল শিশু। কেউ খেলছে হাত-পা নেড়ে। কেউবা ঘুমোচ্ছে। কেউ মাই খাচ্ছে। অবিনাশের বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে। তাড়াতাড়ি। পালিয়ে এসে আবার টিকিট কাউণ্টারের ভিড়ে মিশে যায়।

ঐ তো সেই চাতালটা, মিক্সারটা বসানো থাকতো ওখানে। ভট্‌ভট্‌ শব্দে পায়ের তলার মাটি কাঁপতো থরথর করে। টিকিট কাউণ্টারের ঠিক পাশে সাদা চুনকাম করা দেওয়ালে ঐ তো সেই হাতের ছাপটা—সেই পাতলা ছোট্ট বাঁ হাতের ছাপ। মুগ্ধ স্তাবকদের অনুরোধে একদা রূপসী কামিন বাসিনী তার বাঁ হাতের ছাপকে চিরস্থায়ী করে রেখে গেছে ওখানে।

অবিনাশের বুকের ভিতরটা ! কা রকম অজানা একটা ব্যথায় ঝাঁঝাঁ করে। রাগ করতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু কার উপর রাগ করবে সেইটাই ভেবে পায় না। শেষ পর্যন্ত নিজেরই উপর রাগ করে চট্‌পট্‌ রিক্সা নিয়ে পালায় অবিনাশ।

বাসিনীও হাসপাতালটা দেখে ফি-বছর একবার। ন্যাকড়া জড়ানো মরা সন্তানকে বুকে তুলে অবিনাশ যখন পুঁততে যায় নদীর চড়ায়, বাসিনী যায় পিছন পিছন কোদাল হাতে। এ কাজটা আগে কোন সহৃদয় প্রতিবেশীই করত। এখন আর সময় পায় না তারা। কাজেই শোকাতুরা কাঁচা পোয়াতী বাসিনীকেই করতে হয় সেটা। চড়াটায় যাবার রাস্তাটা হাসপাতালটার ঠিক সামনে দিয়ে। বাসিনী একটু যায় আর ফিরে ফিরে তাকায়। বিরাট একটা দৈত্যের মত বাড়িটা যেন বসে আছে গুঁড়ি মেরে ! অবিনাশ তাড়া দেয়:

‘থরথর চ’—বেশ্‌কো লিয়ে ফের যেতি হব্যাক।’

‘থর যেতে লারছি—লাগছে।’

অবিনাশ অগত্যা গতি কমায়। বাসিনী এখানে এত কি দেখে সে জানে। বেচারার সমস্ত জীবনটাই চুরি হয়ে গেছে এখানে। বাসিনীর মনে কোন সংশয় নাই, কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব নাই। সেই লালমুখো সুপারভাইজারটাকে সে অভিসম্পাত দেয় প্রাণভরে।

‘বেদোকে যেন সাপে খায়—হে মা মনসা-যেন লিব্বংশ হয় এই আমার মত। মুয়ে আগুন দিতে ঝাড়ে-বংশে যেন না থাকে কেউ।’

অবিনাশ চুপ করে থাকে। তার রাগ হয় বরং বাসিনীর উপর।

আজ তাকে গাল দিলে কি হব্যাক—সেদিন তো সেই ছিল তুর রসের লাগর। আমাদিগে তখন চোখেই দেখতিস না। গরবে পা পড়ত না মাটিতে।

বাসিনীর শরীরে রোগ ঢুকেছে। রক্তে নাকি তার কিলবিল করছে পোকা।

খুবই শক্ত রোগ, যে কয়েকজন প্রাইভেট ডাক্তার আছে এখানে তাদেরই একজনের কাছে গিয়েছিল সে একবাব।

ডাক্তাব সুঁই ফুঁডে বক্ত নিল বাসিনীব। জিজ্ঞেস করল। তাবপব বসল এসে চেম্বারে। ডাক্তারের বাঁ হাতে কাগজ আব ডান হাতে কলম অস্থিরভাবে স্থান বদল কবছিল। একবাব তাকাচ্ছিল অবিনাশেব দিকে একবার বাসিনীর দিকে।

'কী কব? মানে চলে কী কবে?'

অবিনাশ নিঃশব্দে বাইবে দাঁড কবান বিক্সাটা দেখিয়ে দেয়।

'হু, কতদিন চালাচ্ছ বিক্সা?'

'আজ্ঞা সে অনেক বছব।'

'তাব আগে?

'আজ্ঞা তাব আগে কণ্টেক্টবেব কাজ কবথম্। ই-সব বাডি-ঘব হাসপাতাল সব আমাদেব হাতে গডা। আমবা বানাইচি।'

একটা সূক্ষ্ম হাসিব বেশ খেলে যায় ডাক্তাববাবুব ঠোঁটেব কোণে, আব অবিনাশেব জলজ্বলে গর্বটা চুপসে যায় সঙ্গে সঙ্গে।

'তোমাব বৌও কবত কণ্ট্রাক্টবেব কাজ?

'আজ্ঞা হঁ, উ ছিল কামিন আব —

'বুঝেছি, তা খুব ফুর্তিটুর্তি কবেছ তখন, য়্যাঁ?'

'আজ্ঞা।' বোকাব মত তাকায় অবিনাশ।

কী ভেবে খুব শক্ত কথাটা আটকে গেল ডাক্তাববাবুব ঠোঁটে।

'শোন, তোমাব বৌ-এব খুব শক্ত অসুখ। সে অসুখ না সারালে ছেলেপুলে বাঁচবে না তোমাব।'

ডাক্তাববাবু খসখস কবে লিখছিলেন সাদা কাগজে। অবিনাশ ক্রমশ আবো বেশী বোকা হযে যাচ্ছিল। বাসিনী সঙ্কোচে আরো বেশী কবে ঢুকে যাচ্ছিল ঘোমটাব তলায়।

লেখা শেষ কবে হাত পাতলেন ডাক্তাববাবু, 'কুডি টাকা'।

'কু—ডি—টা—কা' খুব কষ্টে টেনে টেনে উচ্চাবণ করল অবিনাশ, তাবপব বিনা বাক্যব্যয়ে কোঁচডেব তলা থেকে একটি দলা পাকানো পাঁচ টাকাব নোট মেলে ধবল ডাক্তাববাবু সামনে, আব তো নাই বাবু।'

এই পাঁচটি টাকাব এককালীন সঞ্চয়েব পিছনে অবিনাশের কী পরিমাণ পরিশ্রম এবং কৃচ্ছ্রসাধন আছে ডাক্তাববাবুব তা বোঝার কথা নয়, বুঝলেনও

না। তিনি টাকা পাঁচটি মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে, তারপর কী ভেবে আবার কুড়িয়ে নিয়ে গর্জন করতে লাগলেন। তার মর্মার্থ হলো, ছোটলোকদের চিকিৎসা করাবার শখ থাকা একান্ত অনুচিত। হাসপাতালটা গড়েছি বলে যারা বুক ফুলিয়ে বেড়ায়, তারা যাক না একবার হাসপাতালে। দেখুক একবার মজা।

হাসপাতালের মজাটা দেখেছে বৈকি অবিনাশ।

সাহস করে একদিন হাসপাতালেও গিয়েছিল তারা। লাইন দিয়েছিল টিকিট ঘরটার সামনে। টিকিটবাবু শুধালেন, 'টিকিট আছে'? অবিনাশ কাপড়ের খুঁট থেকে বার করেছিল কণ্ট্রাক্টরের সেই সার্টিফিকেটখানা। ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল সেটা টিকিট বাবু, 'কোম্পানীতে কাজ কর? আইডেনটিটি কার্ড আছে?'

'না বাবু!'

'না বাবু! তবে মরতে এখানে কেন? এখানে কোম্পানীর লোক ছাড়া চিকিৎসা হয় না কারুর।'

অপমানটা হজম করে তবু বলেছিল অবিনাশ, 'বাবু, ই হাসপাতালটা আমরা লিজের হাতে গড্যাছি যে।'

টিকিট বাবু বৃথা বাক্যব্যয় না করে পরের লোকের দিকে মন দিতে দিতে মন্তব্য করে, 'ছোটলোক আর কাকে বলে!'

মরিয়া হয়ে অবিনাশ আবার বলে, 'বিশ্বেস না হয় তো এই দেখুন, আমার বৌয়ের লিজের হাত ছাপ।'

সত্যিই টিকিট কাউন্টারের ঠিক ওপরে পাতলা একটি হাতের ছাপ চুনকাম করা দেওয়ালে। প্রচণ্ড হাসি আর বিদ্রেপের মধ্যে মাথা নীচু করে বেরিয়ে এল অবিনাশ বাসিনীর হাত ধরে।

জগতের কাণ্ডকারখানা সব কিছু বুঝে ফেলবে, তেমন অহঙ্কার অবিনাশের কখনো নেই, বরং অনেক কিছুকেই সে লেখাপাড়া জানা বাবুলোকদের ব্যাপার বলে সরিয়ে রাখে। তবুও এই চল্লিশটা বছরে সে অনেক দেখেছে, অনেক শুনেছে। কণ্ট্রাকটরের বাবুরা তাকে কুলিকামিনদের ম্যাট বানিয়েছিল। দু'শো লোক তার কথায় উঠত বসত। আর সে উঠত বসত বাবুদের কথায়। খাতির তার কম ছিল না। বাবুরা যখন তখন এসে পিঠ চাপড়াত, পেশীবহুল কালো হাত দুটোর দিকে তাকিয়ে বলত 'সাবাস'। একবার বেতন বাড়াবার দাবীতে সব কনট্রাকটরের কুলীদের ষ্ট্রাইক হয়। তাদের কোম্পানীর বড়

সাহেব অবিনাশকে ডেকে বলেছিল, কাজ চালু রাখতে যদি পার কোম্পানী পাকা চাকরী দেবে তোমাকে। অবিনাশ দাঁড়িয়েছিল চুপ করে।

সাহেব আবার বললেন, 'হাসপাতালের কাজ যত তাড়াতাড়ি শেষ করতে পারব আমরা পাবলিকের ততই সুবিধে হবে। এই কাজ কি তোমাদের বন্ধ করা উচিত ?

আর 'না' করতে পারে নি অবিনাশ। শুধু বলেছিল, 'আচ্ছা ওদের বেতন যদি বাড়ে, আমাদেরও বাড়াতে হবে তাহলে, কাজ চালু রাখব আমরা।'

না বেড়েছে বেতন, না হয়েছে চাকরি। এমনটা যে হবে তখনও বুঝত না অবিনাশ। এখন বোঝে। আর তাই বাসিনীকে সে বলেছিল কথাটা অনেক ভেবে চিন্তেই। সোজা পথে যখন হল না, বাঁকা পথে চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?

'ই বাবুদের এমনই নিয়ম, আমরা গড়লম হাসপাতাল, আমরা দিলম্ শরীল—রোগ লিলম শরীলে—আর আমাদেব লেগে ইটো লয় গো, ইটো শুদু ঐ চিকনচাকন বাবুদের লেগে—উঃ, শালাদের একদম মগের মুলুকের বিচার।'

অবিনাশেব পিছন পিছন বেরিয়ে আসে বাসিনী। মরমে মরে রিক্সায় গিয়ে বসে। অবিনাশ নিঃশব্দে প্যাডেলে চাপ দিতে থাকে।

ঘরে এসে অবিনাশ পড়ল বাসিনীকে নিয়ে।

'তুই কসবী, তুই বেশ্যা!'

আহত সাপিনীর মত বাসিনীও হিসহিসিয়ে ওঠে—হঁ, আর তুই একেবারে বিষ্টু ঠাকুর!'

তারপর যেসব বাক্যবাণ পরস্পরের বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, তার তীক্ষ্ণতা আর অশ্লীলতা একেবারে বাঁধনছাড়া।

অবিনাশ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, 'তুর চিকিচ্ছার দায়ী আমি লই।'

বাসিনীও পাল্টা উত্তর দিয়েছিল, 'আমি পালাব তুর মত জানবরের কাছ থিক্যে।'

ঝগড়াটা মিটতে সময় লেগেছিল দু দিন। অবিনাশ ইতিমধ্যে অনেক রকম মতলব ভেঁজেছে রাতেদিনে। বাসিনীরও আর পালাবার দরকার হয় নি। অবশ্য শিশুকালেই অনাথা বাসিনীর যাবার মত জায়গাও কোথাও নেই।

তারপর রাগটা কেন্দ্রীভূত হয়েছে কণ্ট্রাক্টর, এই কারখানার বড় অফিসার, হাসপাতালের কেরানী আর ডাক্তারগুলোর ওপরে।

কানা বুড়ি তখনও বেঁচে। সুসময়ে বাসিনীর অনেক খেয়েছে পরেছে সে।

খাতির কুড়িয়েছে। বাসিনীর প্রথম ছেলেটা যখন মরে যায় তখন হাপুস নয়নে কেঁদেছিল বুড়ি। অকৃত্রিম কান্না। তাবপর যখন দ্বিতীয়টা মরলো, তৃতীয়টা জন্মাল একটা রক্তের ডেলা, তখন আর তার চোখে জল দেখেনি কেউ। অবিনাশ আব বাসিনীর তখন বোজই ঝগডা হয়।

বুড়ি অবিনাশকে একদিন চুপি চুপি বলেছিল ডেকে :

—জামাই, তুমার ঘরে কিসটো ঠাকুর জন্ম লিবেক গো।'

'মানে?' কী বলছিস তু?'

'হঁ, শুন নাই তুমি সেই কংসবধের পালা? কিস্‌টোর মায়ের সাতটা ছেল্যা মোল, অষ্টম গভ্‌ভে জন্ম লিলেক কিস্‌টো। পিরথিমি জুড়ে সেদিন সে কি বাদল, নদীতে বান। কিস্‌টোর বাপ কিসটোকে দিয়ে এল অন্য লোকের ঘরে। তাবপর বড হয়ে উই ত বধ কবলোক কংসকে।

অবিনাশ অবিশ্বাসের হাসি হাসে। বলে, 'তুব চোখটা কানা ছিল, ইবার মাথাটাও গেল গোলমাল হঁয়্যে।'

দৃঢ় প্রত্যয়ের স্বব কানা বুড়িব গলায়, তুমি দেখো গ, আমি মিছা বলি নাই। বাসিব হাথ দেখালাম মায়ের থানে সাধুবাবার কাছে। সাধু বাবা বলেছে—হঁ, মিছা লয় গ'। কোথা থেকে এমন বিশ্বাস পেয়েছিল বুড়ি সে-ই জানে। তাবই মাসখানেক পবে একদিন কলেরায় মরে গেল বুড়ি। কথাটা তারপর ভুলেই গিয়েছিল অবিনাশ। তারপর বাসিনীই একদিন আহ্লাদ করে বলেছিল চতুর্থ সন্তান ধাবনের সময়।

অবিনাশ গা করেনি—ওরও মাথাটা খারাপ হইচে। কিন্তু ষষ্ঠ সন্তানও মাবা যাবার পব থেকে ওবও কেমন যেন বিশ্বাস হয়েছে—হয়তো সাধুবাবা ঠিকই বলেছে।

মাথায় কথাটা গেঁথে গিয়েছে। সপ্তম সন্তানটা মারা যাওয়ার পর এবার যখন আবার সন্তান এলো পেটে, অবিনাশ কিন্তু কিন্তু করে বলেছে বাসিনীকে ওব মতলবেব কথাটা। বাসিনী প্রথমে রাজী হয়নি। বলেছে, 'পেটের সন্তান, বরং যমকে দিতে পারি, তবু পবকে দিতে লারব।'

অবিনাশ বলেছে, 'তোর চিকিচ্ছেও তো হয়েছে। এবার ওটা যদি হাসপাতালে থাকে, দেখিস ও বাঁচবে। শেষ পর্যন্ত আশায় আশায় বাসিনীও রাজী হয়েছে : তা হলে তু নিয়ে যাস, এমনিও যায় ওমনিও যাবে। বাঁচে বাঁচবে হাসপাতালে।

আর একবার অবিনাশ তাকাল বাসিনীর দিকে। উদরের স্ফীতি যেন

হঠাৎ প্রচণ্ডভাবে উঠল নড়ে, আর বাসিনী দু হাতে সাপটে ধরল হাতের কাছে যত কাপড় চোপড়। মুখ দিয়ে, মা…মা গো…তারই ফাঁকে একবার অস্পষ্ট ঘোলাটে চোখে অবিনাশকে দেখতে পেয়ে কাৎরে উঠল—'তুমি কুথায় গ? উঃ।'

অবিনাশ বুঝল সময় ক্রমশঃ কাছিয়ে আসছে। পূর্বাপর করণীয় কাজগুলো আর একবার মনে মনে গুছিয়ে নিল সে। যেতে দু' মাইল আসতে দু' মাইল। অন্ধকার পিছল পথ। তবু অবিনাশের এক ঘণ্টার বেশী সময় লাগবে না। হাসপাতালের বড় গেটটায় একটা দারোয়ান থাকে, ওদিক পানে যাওয়া চলবে না। পিছন দিকটায় একটা গলিমতো আছে সে দিকটাই সুবিধা—ছেলে হওয়ার ঘরটাও কাছে পড়বে ওখান থেকে। পাশেই নার্সদের ঘর। একজন না একজন তো থাকবেই। কান্না শুনতে পাবে। ছুটে আসবে তারপর। হাজার হোক মেয়েলোকের মন, টিকিট বাবুটার মত অত কঠোর হবে না নিশ্চয়। বাচ্চাটাকে তুলে নিয়ে যাবে। ব্যস, তা হলেই অবিনাশের কাজ শেষ নিশ্চিন্ত মনে ফিরে আসতে পারবে সে অবিনাশের বুকের ভিতর পনের বছরের আগেকার রক্ত টলমল করে।

বৃষ্টিটা আবার চেপে এল চার গুণ জোরে। অবিনাশ লক্ষ্য করেনি ভিতরে ভিতরে পরিষ্কার আকাশ কখন আবার ছেয়ে গেছে পুরু কালো মেঘে। চড়বড় শব্দটা হুঁস ফেরাল তার!

কড়কড় শব্দে কাছেই বিরাট একটা বাজ পড়ল। আর বাসিনী হঠাৎ ওঁাউ ওঁাউ করে বিকট শব্দ করেই চুপ মেরে গেল। আর হঠাৎই অবিনাশ দেখল লাল রংয়ের একটা পিণ্ড নাড়ী আর রক্তের মধ্যে পেঁচিয়ে পড়ে আছে বাসিনীর দুটো পায়ের ফাঁকে।

অবিনাশের সারা শরীর কী যেন এক অভূতপূর্ব বিস্ময় আর উত্তেজনায় দোল খেতে লাগল। হাজার হাজার পাখী যেন গান গেয়ে উঠল বুকের মধ্যে। বাইরে জল বয়ে যাওয়ার হড়হড় শব্দকে মনে হতে লাগলো নদীর কল্লরোল। আর সেই মুহূর্তে পৃথিবীর সেই ক্ষুদ্র নতুন আগন্তুকটি তার সমস্ত শক্তি একত্রিত করে চিৎকার করে কেঁদে উঠল। আনন্দে প্রায় লাফিয়ে উঠল অবিনাশ—ছেলে! অষ্টম সন্তান ওর ছেলে! এই বৃষ্টি, এই ঝড়, এই কল্লরোল নদী সমস্ত বাধা পার হয়ে সে কিস্টোকে পৌঁছে দেবে পরের ঘরে। বাঁচবে, বড় হবে। অমিত শক্তিতে সে বধ করবে কংসকে। পিরথিমীতে নিয়ে আসবে ন্যায়ের শাসন। অবিনাশের চোখের সামনে অজ্ঞাত কোন আলোর উৎস থেকে শতশত ধারায়

আলো এসে পৌঁছাতে লাগল বহুদূর থেকে।

অবিনাশ দ্রুত পুরোন রংচটা ফ্লানেলের জামাটা গায়ে চড়াল। তার ওপর পরে নিল ঝিলঝিলে কাগজের একটা আলখাল্লা। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল বাসিনীর দিকে। পরম নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে বাসিনী—যেন ঘুমোচ্ছে। তার চোখের কোণে চিকচিক করছে জল। একটা হাত দিয়ে চেপে ধরে আছে নবজাতককে। মা তো! বুঝতে পেরেছে বোধ হয়—আর একটু পরেই দূরে চলে যাবে তার বুকের ধন। কোথায় কোন বন জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে দুস্তর কোন অন্ধকার থেকে যাকে ডেকে এনেছে সে—আশ্রয় দিয়েছে দশটা মাস পাঁজরের খাঁচায়—বড় ব্যথা তো লাগবেই।

অবিনাশ দুই হাত বাড়িয়ে ধরে আঙল জাঙ্গল সেই শিশুকে—ধীরে ধীরে সরিয়ে দেয় বাসিনীর শিথিল হাতটা। হাতটা উঠে এসে আলতোভাবে জড়িয়ে ধরল অবিনাশের একটা হাত—যেন অনুনয়ের ভঙ্গিতে। হাতটা ছাড়িয়ে দিতেই ধপ করে পড়ল সেটা পাশের ভিজে মাটিতে।

অবিনাশ সাপটে দু হাতে তুলে নিল সবশুদ্ধ পিণ্ডটাকে। এত হালক ছোট্ট এতটুকু বুকের কোথায় সোনার কৌটায় লুকনো আছে প্রাণভোমরা। কে জানে? হয়তো সে ভোমরাটাকে পিষে মেরে ফেলবার জন্য এতক্ষণ আকাশপথে উড়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে তারা। চিলের মত চক্কর দিচ্ছে মাথার উপরই কোথাও। শিউরে উঠে বুকের আরো কাছে চেপে ধরে তাকে দুটো হাতে।

'কিন্তু বাসিনী—বাসি! আমার বাসি। জন্ম থেকে আজ অবধি যার বুক শুধু শুকনো মরুভূমি।' অবিনাশের বুকের ভেতরটা আছড়াতে লাগল। 'ঘুম ভাঙলে তুই চোখ বুঁজে থাকিস বাসি। হাত নড়াস না। পাশ ফিরিস না। মিছামিছি কেনে দুখ পাবি তুই। ই যে তোর কোলে থাকার লেগে লয়। তুই কাঁদিস না বাসি।'

অবিনাশ আগড় খুলে পথে নামে। পায়ের তলায় পিছল মাটিতে টলমল করে না। দুটি হাত অঞ্জলি করে বুকের মাঝটিতে জাপটে ধরে থাকে। পিছন ফিরে তাকায় একবার—আগড়ের ফাঁকের ভিতর দিয়ে কুচিকুচি আলোর কণা চোখে পড়ে। আবার সামনে তাকায় অবিনাশ।

হুসহাস পা ফেলে চলতে থাকে। সোঁ সোঁ করে বাতাস বয় গাছের পাতা দুলিয়ে—অবিনাশের মনে হয় কাঁদতে কাঁদতে কে যেন আসছে তার পিছনে। ও কে তা সে জানে না—হয়ত বাসিনী, হয়ত বা কংসের চর কেউ। আরো দ্রুত পা চালায়। কিষ্টোকে যশোদার ঘরে পৌঁছে দেবেই সে। []

শিক্ষানবিশ

কগিং গ্যালারীর উপর বসানো মাইক্রোফোনের চোঙ্গা হঠাৎ কর্কশ গর্জন করে উঠল,

'সোকিং পিট, প্লীজ স্টপ রোলিং—সেভন হানড্রেড ইন ট্রাবল। প্লীজ স্টপ···।' সোকিং পিটের চৌকো সিন্দুকের মত খোপগুলোর একটা থেকে তুলে নেওয়া সাড়ে বারোশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে টকটকে লাল ইস্পাতপিণ্ডটাকে তার সরু ঠোঁটে কামড়ে ধরে সোকার ক্রেনটা কিছুক্ষণের জন্য হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মাঝপথে। তারপর আবার বিকট ঘড়ঘড় আওয়াজ তুলে খানিকটা পিছিয়ে এসে ধাতুপিণ্ডটাকে যে খোপ থেকে তুলে নিয়েছিল সেই খোপেই নামিয়ে রাখল, তারপর তার আগুনের চুমু খাওয়া লাল ঠোঁটদুটি তুলে নিয়ে পালকে ঠোঁট ডুবানো অতিকায় এক সারস পাখির মত ঝিমোতে লাগল।

সোকিং পিটের সার সার গর্তের সঙ্গে সমান্তরাল লাইন করে চলে গেছে এক সার রোলার, মিলের একেবারে শেষপ্রান্ত পর্যন্ত। সেই রোলারের সার যে দুটি জায়গায় বিচ্ছিন্ন হয়েছে সেখানে লোহার বিরাট বিরাট ফ্রেমের মধ্যে বসান দু'টি দু'টি চারটি রোল। ধাতুপিণ্ডটিকে চেপে উল্টিয়ে আবার চেপে একটি লম্বা কড়িবরগার মত 'বিলেট' তৈরী করা এদেরই দায়িত্ব। প্রথম ফ্রেমটির বিশাল রোল দু'টির ব্যাস অনুসারে শ্রমিকদের কাছে তার পরিচয় 'নাইন হাইড্রেড মিল' এবং পরেরটির নাম অনুরূপ ভাবে 'সেভন হাইড্রেড মিল'। গরম ধাতুপিণ্ড রোলারের দ্বারা বাহিত হয়ে নাইন হানড্রেড মিলে এসে কিছুটা আকৃতি পায়, বাকীটুকু শেষ করে সেভন হানড্রেড। সেই সেভন হানড্রেডেই গোলমাল।

করাতে কাটা সুন্দরী কাঠের গুঁড়ির মত বিরাট বিরাট চৌকো লম্বা লাল দুটো ব্লুম পড়ে আছে রোলারগুলোর উপর মাঝরাস্তায়। সেভন হানড্রেড ঠিক না হওয়া পর্যন্ত তারা ঐ রকম পড়ে থাকবে আর একটু একটু করে তাপ বিকীরণ করে চারপাশের আবহাওয়াকে গরম করবে, তারপর একসময় নিরুত্তাপ হয়ে একেবারে কালো হয়ে গেলে শববাহী শকটের মত ঢং ঢং ঘণ্টা

বাজাতে বাজাতে আসবে ওভারহেড ক্রেন। তার ইংরাজী 5 এর আকৃতির হুক থেকে ঝোলানো লম্বা লম্বা তারের দড়ি বাঁধা হবে ব্লুমগুলোর গলায় পাছায় তারপর স্ক্র্যাপবাহী ওয়াগনে চড়ে যাত্রা করবে স্ক্র্যাপ ইয়ার্ডের শ্মশানের দিকে।

"মিঃ মুখার্জী, মেইনটেন্যান্স ফোরম্যান, ফোনে আপনাকে পাওয়া যাচ্ছে না, যেখানেই থাকুন আপনার ক্রু নিয়ে সেভন হাড্রেডে চলে আসুন। মিঃ মুখার্জী......" মাইক্রোফোন আবার গর্জন করতে লাগল।

ততক্ষণে সেভন হানড্রেডের সামনে কৌতূহলী শ্রমিকদের ছোটখাটো একটা ভীড় জমে গেছে। মিলের অপারেটররা নেমে এসেছে এয়ারকুলার বসানো অপারেটিং চেম্বার থেকে। তারা মিল ফোরম্যানকে কী যেন বোঝাচ্ছে হাত নেড়ে নেড়ে—আর মিল ফোরম্যান স্ট্যাচুর মত দাঁড়িয়ে আছে মুখময় বিরক্তি নিয়ে। চোখের পাতাটিও নড়ছে না।

অশোক এসবই দেখছিল। সোকিং পিট কন্ট্রোল রুমের উঁচু রেলিং ঘেরা বারান্দা থেকে পুরো মিলটার একটা স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। তার ছোট্ট ডায়েরীটি (যাতে সে এতক্ষণ কন্ট্রোল চার্ট থেকে খোপগুলির টেম্পারেচার নোট করছিল) মুড়ে রেখে সে অবাক হয়ে তাকিয়েছিল নিশ্চল মিলগুলোর দিকে। তিন বছর বেকার থাকার পর তার এই একমাস পাওয়া চাকরীটার ঘেরঘোর এখনো কিছুই বুঝে উঠতে পারেনি সে। হাতের কাছে যেখানে যা পাচ্ছিল তার ছোট্ট ডায়েরীটায় নোট করছিল আর যাকে তাকে যা তা প্রশ্ন করে উত্যক্ত করে তুলছিল। ভাবটা এই রকম যেন এই মিলটার আটঘণ্টার খুঁটিনাটি কিচ্ছুটি যেন তার চোখ এড়িয়ে না যায়। চার পাশে এইসব বিরাট বিরাট যন্ত্রপাতি, কত এদের দাম, আর কার যে কী কাজ—সে সব কিছুই এখনো জানে না সে। কীভাবে হুড়মুড় করে হঠাৎ দুমদাম শব্দে কাজ শুরু করে দেয় অথবা হঠাৎ কাজ বন্ধ করে দিয়ে ক্লান্ত গরুর মত চুপচাপ ঘুমিয়ে পড়ে সে এখনো তার কাছে বিস্ময়। সে শুধু সর্বক্ষণ তার বড় বড় দুটি চোখ মেলে ঘটনাবলীকে অনুসরণ করে তার ডায়রীর পাতা ভর্তি করে।

হঠাৎ কন্ট্রোল রুমের দরজা খোলার শব্দ হতেই সেদিকে তাকালো অশোক। একটু থলথলে ফুলো ফুলো গাল, সিনিয়র হিটার থপথপে পা ফেলে অশোকের পাশ দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে চলে গেল।—'রোলিং কখন শুরু হবে?' অশোকের এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি ঠোঁট উল্টিয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এক দুর্বোধ্য

ভঙ্গি করলেন এবং গাম্ভীর্য অক্ষত রেখে যেদিকে যাচ্ছিলেন চলে গেলেন।

আর এখানে দাঁড়িয়ে থাকা নিরর্থক ভেবে অশোক গুটি গুটি সিঁড়ি বেয়ে ফ্লোরে নামল তারপর সেভন হানড্রেড মিলের দিকে এগিয়ে চলল। মিলে রোলিং বন্ধ। অনেকেই নিজের নিজের জায়গাটা ছেড়ে নেমে এসেছে তারপর এক একটা জায়গায় পাঁচজন সাতজন মিলে জটলা করছে। সেভন হানড্রেডের ভীড় ততক্ষণে বেশ কিছুটা পাতলা হয়ে এসেছে, শুধু মিল ফোরম্যান একখানা সিগারেটে ধরিয়েছেন—পা ফাঁক করে একটা হাত পকেটে আর একহাতে সিগারেটে গভীর টান দিচ্ছিলেন তিনি। ভাবী স্ট্যাণ্ডের মাঝে রোল দুটো তখনো নিশ্চল। বোঝা যায় মিঃ মুখার্জী বা তাঁর ক্রু কেউ তখনো এসে পৌছান নি।

সময় যতই পেরিয়ে যাচ্ছিল অশোক ততই একটা চাপা উত্তেজনা বোধ করছিল নিজের মধ্যে। কী একটা অজানা আবেগ ভেতরে ভেতরে প্রবল হয়ে উঠছিল তার। মনে হচ্ছিল যদি তার ক্ষমতা থাকত যাদুকর ম্যানড্রেকের মত—একটা অদৃশ্য যাদুশক্তি, তাহলে এই মুহূর্তে যাদুদণ্ডের স্পর্শে এই অচল দানবগুলোকে সচল করে দিত সে। ঘড়ঘড়ে আওয়াজ তুলে আবার চলত ক্রেন—লম্বা ঠোঁট ডুবিয়ে—সোকিং পিটের গর্ত থেকে টকটকে লাল ইস্পাত-পিণ্ডগুলো তুলে এনে রোলার টেবিলে ছেড়ে দিত। নাইন হানড্রেড মিলের কঠোর-নিষ্পেষণে আর্তনাদ উঠত, ফুলঝুরি উড়ত আকাশে। কিন্তু না, এসব কিছুই করতে পারবে না সে। ফোরম্যান তখনো পকেটে হাত দিয়ে ছাদের দিকে মুখ করে সিগারেট টেনে চলেছেন। অশোক কী করবে ভাবছিল। হঠাৎ দুম করে ফোরম্যানকে জিজ্ঞেস করে বসল সে, 'আচ্ছা গণ্ডগোলটা কী হয়েছে এখানে?' ফোরম্যান ছাদ থেকে চোখ নামিয়ে নিয়ে এলেন অশোকের উপর তারপর ফোলা ফোলা গালের চাপে ছোট হয়ে আসা চোখ দিয়ে আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। তারপর চোখ তুলে নিয়ে আবার দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলেন ছাদের তলায় N আকৃতির স্ট্রাকচারগুলোর দিকে এমন নির্বিকার ভঙ্গিতে যেন তিনি কিছু শুনতে পান নি, যেন তিনি ছাড়া আর কেউ আশে পাশে নেই।

ফোরম্যানদের এইসব রকমসকম এই কদিনেই বেশ বুঝে গেছে অশোক। কোন প্রশ্ন করলে এই রকম শুনতে না পাওয়ার নির্বিকার ভঙ্গি করে, নয়তো বলে 'পরে এসো' এবং সে 'পরে' আর কোনদিন নিকট হয় না। এই রকম বাধা পেতে পেতে স্বভাবতঃ যা হয়, একটা প্রতিরোধমূলক মানসিকতা জন্মে গেছে অশোকের। 'পরে এসো' বললে দিনে তিনবার অফিসে হানা দেয়,

শুনতে না পাবার ভান করলে আবার জিজ্ঞেস করে এবং কোনখান থেকে কণা-মাত্র জ্ঞাতব্য আহরণ করতে পারলে সঙ্গে সঙ্গে নোট বইতে লিখে ফেলে। তার এই অদম্য জ্ঞানস্পৃহা যে আসলে কৃত্রিম এবং খাঁটি উদ্দেশ্য হোল অফিসারদের 'তেল' দেওয়া সেটা পবিচিত বন্ধু-মহল ইতিমধ্যেই তাকে জানিয়েছে কিন্তু তাতে অশোকের এই স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি।

'আচ্ছা এখানে ট্রাবলটা কী হয়েছে একটু বলবেন?' এবার জিজ্ঞেস করল অল্প উঁচু গলায়। তাব এই প্রশ্নটাও বৃথা গেল কেননা উল্টোদিক থেকে কালি ঝুলি মাখা একজনকে আসতে দেখে ফোবম্যান হঠাৎ খুব ব্যস্ত হয়ে পডলেন এবং কথা বলতে বলতে সিঁড়ি বেয়ে কেবিনে উঠে গেলেন।

অতঃপর শূন্য, হতাশ হাত নেড়ে বিরক্তি প্রকাশ করল অশোক। মিঃ মুখার্জীব টিকিটিও দেখা যাচ্ছে না, প্রায় পনের মিনিট হতে চলল। শেড-এর ওপর থেকে হাই পাওয়াব বাল্বগুলো ফ্যাকাশে চোখে চেয়ে আছে জনশূন্য মিলফ্লোবের দিকে। স্টীমলাইনে সোঁ সোঁ শব্দ তুলে একজস্ট দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে সাদা সাদা মেঘ। ব্লোয়ার চলছে, ম্যানকুলার চলছে। এইসব শব্দ মিলেমিশে আর একটা অদ্ভুত শব্দ তৈবী হচ্ছে। সহসা অশোকের মনে হোল এমন তো হতে পাবে যে মিঃ মুখার্জী শুনতে পান নি। মাইকের আওয়াজ যথেষ্ট জোর বটে কিন্তু মিঃ মুখার্জীর অফিসটাও মিলেব একেবারে শেষ প্রান্তে—সুতরাং…। অশোকেব কেন জানি মনে হোল একবার মিঃ মুখার্জীর অফিসটায় দেখা দরকার কেউ আছে কি না। অন্ততঃ খবর যদি না পেয়ে থাকেন তবে খবরটা পৌঁছে দিতে দোষ কি!

এইসব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে অশোক হাজির হোল মেইনটেন্যান্স ফোরম্যানের অফিসে এবং অবাক হয়ে দেখল মিঃ মুখার্জী বসে আছেন চেয়ারে, খুব উত্তেজিত। সামনে একদল কালিঝুলিমাখা লোক তাব নাকের সামনে উত্তেজিত হাত নাড়ছেন। অশোক হতাশভাবে দাঁড়িয়ে থাকল দরজার গোড়ায়, কানে এল, 'আমাদেব সাবান কই? আমরা হাত ধোব কিসে? আমাদের কি জানোয়ার পেয়েছেন, য়্যাঁ? আমাদেব কি জানোয়ার পেয়েছেন?' মিঃ মুখার্জীর চোখমুখ উত্তেজনায় লাল, ঝোলা গালের চামড়া নাচছে মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে। টেবিলে চাপড় মেরে তিনিও চেঁচাচ্ছেন সমানে, 'আমি কি চেষ্টার কম করেছি? এই তো দেখ রিকুইজিসন। তিনমাস হোল প্রেস করে দিয়ে বসে আছি। স্টোরসের বাবুদের ফোন করে করে অস্থির। যতসব অপদার্থের দল জুটেছে চারদিকে আর আমার শালা যত ঝকমারি।'

'ওসব কিছু শুনতে চাইনা আমরা। বুজরুকি ঢের ঢের দেখেছি। আর সব ডিপার্টমেণ্টের লোকেরা সবাই সব কিছু পাচ্ছে কেবল উনিই পান না— নাকে তেল দিয়ে ঘুমোলে কিছু পাওয়া যায় না।'

কতক্ষণ চলত এইরকম বলা যায় না, অশোক হঠাৎ সামনের ভিড়টা দুহাতে একটু সরিয়ে মুখ উঁচু করে মিঃ মুখার্জীকে ডাকল।'

'শুনুন 'সেভন হানড্রেডে' আপনাকে ডাকছে—মিঃ বায় বয়েছেন সেখানে।' অশোক মিথ্যে করে সুপারিণ্টেণ্ডের নাম বলল। ভিড, গোলমাল। মিঃ মুখার্জীর কানে শুধু দুটি কথা পৌছাল 'সেভন হানড্রেড' আর মিঃ রায়। দুটো কথা মুহূর্তে পারম্যুটেশন কম্বিনেশন হয়ে যা দাঁড়াল তাতে ভাবলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে হয়ত খবব দেওয়া হয়েছে ট্রাবলটার ব্যাপাবে এবং তিনি মিঃ মুখার্জীকে ডাকছেন। ট্রাবলেব খবব অনেক আগেই পেয়েছেন তিনি, তাছাডা এই গণ্ডগোল থেকে বাইবে আসার এটা একটা সুযোগও বটে। তিনি হাতেব ইশাবায় অশোককে দাঁডাতে বললেন তারপব কোণায় ঠেস দিয়ে রাখা একটা মস্ত বেঞ্চ তুলে নিয়ে চেয়ারটা ঘুবে একদম বাইরে।

'কতক্ষণ হোল ট্রাবলটা চলছে? মিঃ বায় কখন এলেন?'

অশোক একটা মনগড়া উত্তব দিল। তারপর জিজ্ঞেস কবল, 'আপনাব লোকজনদেব নিলেন না—ওবা না এলে কি করে কী হবে?'

ফোবম্যানে একটু অস্বস্তি বোধ করল উত্তর দিতে।

'ও শালারা আমাব কথায় কেউ আসবে না। আচ্ছা আমাদের চার্জম্যানকে দেখেছেন ওদিকে? দেখেন নি। তবে সে শালাও সেভন হানড্রেড অ্যাটেণ্ড কবেনি, আশ্চয!'

কথায় কথায় ব্রেকডাউনটার কাছে পৌছলেন তাঁরা। অপারেশন ফোরম্যান দাঁড়িয়ে আছেন পকেটে হাত পুরে আর সেই কালিঝুলি মাখা লোকটা মিলের গর্তের মধ্যে নেমে গিয়ে নাটবল্টুতে চাপ দিচ্ছে একটা রেঞ্চ লাগিয়ে। মিঃ মুখার্জী অপারেশন ফোরম্যানের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিঃ রায় এসেছেন শুনলাম, কোথায় গেছেন দেখলেন? অপারেশনের চোখ দুটো কুঁচকে গেল, ভাঁজ পড়ল কপালে—মনে মনে মন্তব্য করলেন, 'শালা তেলবাজ পার্টি কোথাকার!' মুখ গম্ভীর করে মুখার্জীকে বললেন, মিঃ রায়ের খোঁজ করার আগে ট্রাবলটা কী এটা খোঁজ করা করা আপনার উচিত ছিল মিঃ মুখার্জী। ডেকে ডেকে আমাদের গলা ফেটে গেল আর আপনারা সব

ঘুমোচ্ছেন। এই যে আধঘণ্টা প্রোডাকসন বন্ধ এর উত্তর কে দেবে, আপনি না আমি?'

মিঃ মুখার্জী এককালে চার্জম্যান ছিলেন কোন এক প্রাইভেট কোম্পানীতে। এখানে এই গভর্ণমেণ্ট কারখানায় এসে ফোরম্যান হয়েছেন এবং তাঁর বিশ্বাস সেটা হয়েছেন কাজ দেখিয়ে। এইসব কচিকাঁচা অফিসাররা যারা কাজের 'ক' বোঝেনা তারা তাই হিংসে করে তাঁকে। অপমান করার ছুতো খোঁজে।

তিনিই বা ছেড়ে দেবেন কেন? মাইনে তো একই পান—একই টাইপ কোয়ার্টারে থাকেন। অপারেশন ফোরম্যানের দিকে তেড়ে গেলেন তিনি আর চিৎকার করতে লাগলেন 'মুখ সামলে কথা বলহে ছোকরা। গাল টিপলে দুধ বেরোবে এখনো, কাজের কী বোঝ তুমি য়্যাঁ! তোমার মত ঐ পকেটে হাত দিয়ে ফুসফুস করে সিগারেট টানার চাকরী নয় আমার। এ চাকরী করতে কব্জির জোর চাই। কোম্পানী তো অমনি অমনি প্রোমোশন দিয়ে দেয়নি—কাজ দেখে তবে দিয়েছে।'

'কাজের কথা আর বলে কাজ নেই! প্রাইভেট কোম্পানী তো ঝেড়ে ফেলে দিয়েছিল, নেহাত পাবলিক সেক্টার বলে এসব সহ্য করছে আপনাব। কোম্পানীর বারোটা বেজে যাবে আপনার মত অপদার্থ অফিসারদের জন্য।'

তারপর মুখার্জীর মুখ থেকে যে সব বাক্যবাণ বেরোতে লাগল অপারেশন ফোরম্যান লাফাতে লাগলেন তার তেজে। পরস্পর চেঁচামেচিতে সরগরম হয়ে উঠল সমস্ত মিল ফ্লোর। পিটে নেমে যে লোকটি নাটবল্টু টাইট দিচ্ছিল সে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। আর অশোক জীবনে এরকম অভিজ্ঞতা অল্পই ঘটে জেনে ডায়রীটা বগলে চেপে প্রাণপণে দৃশ্যটা উপভোগ করতে লাগল! সেভেন হানড্রেড মিলের রোল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল জেদী ঘোড়ার মত নিশ্চল ভঙ্গীতে আর হঠাৎ দমকা হাওয়া লেগে সিলিং থেকে ঝোলানো আলোগুলো দুলতে লাগল—ব্যাপারটাতে তারাও যেন খুব মজা পেয়েছে। যারা এতক্ষণ গুলতানি করছিল তারা সব এসে দাঁড়িয়েছে একটু দূরে—কিছুটা তফাৎ রেখে। সেদিকে চোখ পড়তেই অপারেশন ফোরম্যান কী বলতে যাচ্ছিলেন থেমে গেলেন। তাকালেন মিঃ মুখার্জীর দিকে—আর তিনিও পাল্টা উত্তর দেবার জন্য পাগলা ষাঁড়ের মত শিং উঁচিয়ে অপেক্ষা করছিলেন, মুহূর্তে শান্ত ভাব ধারণ করলেন। তারপর দু'জনের চোখে চোখে কী কথা হোল এবং সমস্ত পরিস্থিতির উপর কে যেন শান্তিজল ছিটিয়ে দিল। অপারেশন ফোরম্যান ধীরে ধীরে চলে গেলেন তাঁর অফিসের দিকে। মিঃ মুখার্জী শুধু একবার তাকালেন

ওপাশের কৌতূহলী ভিড়েব দিকে, তারপর হেঁট হয়ে ধীবে ধীরে নামিয়ে রাখা রেন্চটা সংগ্রহ কবে যেদিক দিযে এসেছিলেন সেদিক ফিরে হাঁটা দিলেন। দু'পা এগিয়ে হঠাৎ চোখ তুলে তাকাতেই চোখাচোখি হোল অশোকের সঙ্গে। সে তখনো সেইরকম হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে।

'আপনাব নামটি কী?'

'অশোক দস্তিদাব।'

'টিকিট নম্বব?'

'অ্যাপ্রেনটিশতো—টিকিট নম্বব নেই।

'কোন সেকসান? বোলিং মিল?'

'না, ল্যাববেটবি।

'তবে এখানে কেন? চোখ কুঁচকে গেল।

'কাজ দেখাব জন্য পাঠিযেছে।'

আবাব হাঁটতে লাগলেন মিঃ মুখার্জী। অশোক পিছন পিছন ছুটে তাঁব সঙ্গ ধরল।

'আচ্ছা স্যব এখানকাব ট্রাবলটা কী?'

কোন জবাব না দিযে হনহন কবে এগিয়ে গেলেন তিনি।

সাতদিন পব ল্যাববেটবি অফিস থেকে ফোনে জানান হোল অশোককে সেইদিন দুপুব দুটোতে ট্রেনিং ইঞ্জিনিয়াবের সঙ্গে অতি অবশ্য দেখা কবতে। জরুরী দবকাব।

'কী ব্যাপাব বলুন তো?' জিজ্ঞেস করল অশোক।

'সেসব কিছু জানি না। নোট শীট পাঠিয়েছে দেখা কববাব জন্য।' ঘটাং কবে ফোন বেখে দেওয়াব শব্দ হোল।

অশোক ভয়ে ভয়ে বইল সমস্ত দিন। বন্ধুবান্ধবদেব জিজ্ঞেস কবল আব কাউকে দেখা কবতে বলেছে কি না। কাউকে বলেনি। তাবপর সময়মত গুটিগুটি ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্টের দিকে বওনা হোল।

বাইবে বৈশাখেব আগুন ঝবা রোদ। ট্রেনিং ডিপার্টমেণ্ট প্রায় একমাইল দূব। অশোক যখন পৌছাল তখন তাব মুখচোখ লাল হয়ে উঠছে। ট্রেনিং ইঞ্জিনিয়াবের ঘরের সামনে স্প্রিং ডোব। বাইবে নেমপ্লেটেব পাশে 'ইন' লেখা। দবজাব পাশে টুলেব উপব ঝিমোচ্ছে আর্দালী। ধু ধু সামনের মাঠটার

একটা কোণায় কলের তলায় জমে থাকা জলে চান করছে কতকগুলো কাক।

অশোক কি করবে একবার ভাবল তারপর সুইং ডোর ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল।

ইঞ্জিনিয়র সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে টেবিলের উপর পা তুলে একটু দ্বিপ্রাহরিক আয়েশ উপভোগ করছিলেন। অশোকের পায়ের কর্কশ শব্দে ঘুম ছটকে গেল। তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে পা নামিয়ে স্বাভাবিক হতে গেলেন, পা লেগে কাঁচের গ্লাসটা ঝনঝন করে মাটিতে পড়ে ভেঙ্গে গেল। অপ্রস্তুত অবস্থাটা কাটিয়ে নিতে যেটুকু সময় লাগল তারপরই গজন করে উঠলেন, 'হু, হু আর ইউ?'

অশোক আরো ঘাবড়ে গেল। কোন রকম ভাবে জানাল, 'স্যর আপনি আমাকে ডেকেছিলেন আজ।'

'ও, তা ডেকেছিলাম তো কী হয়েছে। এখানে আসার আগে পারমিশন নিয়ে আসতে হয় জানোনা? আই অ্যাসিয়ুম ছাট ইউ পসেস্ দিস্ মিনিমাম সেন্স অফ সিভিলিটি। বেয়ারাটা নেই দরজায়?'

অশোক নিঃশব্দে ঘাড় চুলকোতে লাগল।

ট্রেনিং ইঞ্জিনিয়ার ফাইল ওল্টাতে লাগলেন।

'কি নাম তোমার?'

'আজ্ঞে, অশোক দস্তিদার।'

'ও, কি করেছিলে?'

অশোক প্রশ্নটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। তার পা দুটো ব্যথা করছিল। চারপাশে ভারী ভারী সোফা কোচ কেনের চেয়ার শূন্য পড়ে আছে কিন্তু সে বুঝতে পারল না কেন তাকে বসতে বলা হচ্ছে না। হয়তো বসতে বলা হবে না, নিজেই বসতে হবে এটিই দস্তুর এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে অশোক একটা চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই ধুপ করে বসে পড়ল।

ট্রেনিং ইঞ্জিনিয়ার একবার চোখ তুলে তাকিয়ে আপাদমস্তক মেপে নিলেন। ততক্ষণে ফাইলে যা চাইছিলেন তা পেয়ে গেছেন। একখানি চিঠি। ছাপানো প্যাডে এক ডিপার্টমেণ্ট থেকে আর এক ডিপার্টমেন্টে পাঠানোর জন্য যা সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় সেই জিনিস। চিঠিখানি তুলে দিলেন তিনি অশোকের হাতে।

'পড়।'

পড়ল অশোক। মাথা ঘুরে গেল তার। চোখের সামনে লাল নীল আবর্ত সৃষ্টি করে দ্রুত ঘুরপাক খেতে লাগল। তিন বছরের বন্ধ্যা অতীত—বৃদ্ধা মা, রিটায়ার্ড বাবা। টেবিলের উপর রাখা হাত দুটির উপর বাঁধনহারা মাথাটা নেমে এল আস্তে আস্তে। কমপ্লেন করেছেন সেই অপারেশন ফোরম্যান ট্রেনিং ইঞ্জিনিয়রের কাছে অশোক দস্তিদার নামে তাঁর একজন য্যাপ্রেন্টিস বিনা অনুমতিতে কারখানার যন্ত্রপাতি নিয়ে ছেলেখেলা করে। সংশ্লিষ্ট সেই ব্যক্তিকে একথা জানিয়ে দেওয়া হোক তার এই অনাবশ্যক কৌতূহলের ফলে যদি যন্ত্রপাতির কোন ক্ষতি হয় অথবা কোন দুর্ঘটনা ঘটে তবে সেই দায়িত্ব পূর্বোক্ত ব্যক্তির উপর বর্তাবে।

'কী করেছিলে সত্যি কথা বল আমার কাছে—ভয়ের কিছু নেই।' মনে হোল একটু ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছেন ট্রেনিং ইঞ্জিনিয়র।

'আমি কিছু করিনি স্যর, সত্যি বলছি আমি কিচ্ছু বুঝতে পারছিনা।'

'এ্যাই দেখ, তাকাও, তাকাও আমার দিকে' অশোকের হাতে টোকা দিয়ে চোখে চোখ রাখলেন, 'সাত বছর এই চেয়ারে বসে ঐ একই কথা শুনছি। কেউ কিছু করে না, আর মিল ফোরম্যানরা তাদের সঙ্গে শত্রুতা করে কমপ্লেন পাঠাচ্ছে কেমন। প্রোডাকশন হ্যামপার করবে, জাতির ক্ষতি করবে—আর ভেবেছ গবর্ণমেণ্টের কারখানা, সবেতেই পার পেয়ে যাবে তাই না।' চোখমুখ থেকে অদ্ভুত এক বিদ্রূপ থুতুর কণার মত ছিটকে এসে অশোকের গায়ে লাগতে লাগল।

'বিশ্বাস করুন স্যর, আমি কিচ্ছু করিনি।'

অশোকের কথায় কান না দিয়ে তিনি বলে চললেন—

'একটা কথা মনে রেখো, তোমরা শিক্ষানবিশ, শিখতে হবে ওঁদের কাছ থেকেই। ওঁরা কী ভাবে কাজ করেন, কী ভাবে কারখানার জটিল সমস্যা বিশ্লেষণ করেন তাঁদের বহুবছরের অভিজ্ঞতার আলোকে সেগুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে, অনুসরণ করতে হবে তাঁদের। তবেই তো পরে যখন নিজেকে দায়িত্ব নিতে হবে তখন কর্তব্য ঠিক করতে বেগ পেতে হবে না।' দীর্ঘ বক্তৃতার শেষে হাঁফাতে লাগলেন তিনি।

'এরপর থেকে তাই হবে স্যর।' অশোকের চোখে বোধহয় গরম হাওয়ার ঝাপটা লেগেছে, না হলে তার চোখ এমন অসময়ে ঝাপসা হয়ে এল কেন?

'শোন, এই প্রথমবার বলে কঠোর শাস্তি কিছু দেওয়া হোল না শুধু ট্রেনিং পিরিয়ড ছ'মাস বাড়িয়ে দেওয়া হোল।'

'ঠিক আছে স্যর।'

পাগলের মত টলতে টলতে অশোক বেরিয়ে এল বাইরে—সোকিংপিটের আগুনের মত টকটকে লাল রোদে। ট্রেনিং ডিপার্টমেন্টের গেটের কাছেই বিরাট একটা বোর্ডে কালো কালো বড় বড় অক্ষরে লেখা :

"আস্ক নট হোয়াট প্ল্যাণ্ট ক্যান গিভ ইউ,
আস্ক হোয়াট ইউ ক্যান গিভ টু দি প্ল্যাণ্ট"

ঝকমকে রোদের সমস্ত বর্ণালীটুকু নিঃশেষে শুষে নিয়ে অক্ষরগুলোকে এখন একটা লম্বা কালো কোব্রার মত মনে হচ্ছে অশোকের ঝাপসা চোখে। বুজে আসা গলাটা ঝাড়তেই একদলা কফ উঠে এল গলায় আর সেটা থপ করে পড়ল গিয়ে কোব্রাটার ঠিক মাথায়—তারপর সূর্যকিরণের প্রতিসরণ হেতু একখণ্ড মুক্তোর মত ঝকমক করতে লাগল সেটা। []

মিঃ মেহতা

—কি নাম আছে?

—আজ্ঞে, বাদল মিত্র।

—রুরকেল্লা না ভিলাই?

—রুরকেল্লা।

তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। প্রশ্নকারী অবাঙ্গালী ব্যক্তিটি কতকগুলো কাগজে সই করছিলেন। বাদল জয়েনিং রিপোর্টটা বাড়িয়ে ধরে ঘামছিল।

—বোস।

হাতের কলমটা বাড়িয়ে সামনের খালি চেয়ারটা বাদলকে দেখিয়ে দিয়ে একমনে কাজ করতে লাগলেন ব্যক্তিটি।

বড়সড় একটা হলঘরকে জালি বোর্ডের পার্টিশনে একই রকম চারটে খুপরি বানানো হয়েছে। প্রত্যেকটির কোটরেই আছেন একজন প্রশ্নকারী অফিসার। প্রত্যেকের সামনেই গাদা করা আছে কাগজপত্র—প্রত্যেকের দরজার কালো কাঠের ফালির উপর সাদা পেইন্টের লেখা সস্তা নেমপ্লেট। কারখানা চালু হবার আগেই কিছু শিক্ষানবিশকে নিয়োগ করে ট্রেনিং-এ পাঠনো হয়েছিল রুরকেল্লা বা ভিলাইতে, তাদের সকলকে এখন ডেকে পাঠানো হয়েছে। কারখানা চালু হবে এবার।

সই করা কাগজের স্তূপ একপাশে সরিয়ে চেয়ারের পিঠে শরীরটাকে ছেড়ে দিয়ে একটা সিগারেট ধরালেন প্রশ্নকারী ব্যক্তিটি। উপুড় করা হাতের মুঠোয় দেশলাই। হাতটা মেলে দিতেই অনামিকায় প্রকাণ্ড আংটিটার দিকে নজর পড়ল বাদলের। সায়ানাইডের মন্ত্রবকণ্ঠী জমিতে গোটাগোটা ইংরাজীতে লেখা—মেহতা।

চমকে ওঠার দরুন প্রশ্নটা এলোমেলো হয়ে গেলো বাদলের। আপনিই মেহতা, মিঃ মেহতা।

ও, ইয়েস! বাট, হোয়াই?

না, মানে—আপনার কথা অনেক শুনেছি রুরকেল্লায়, সপ্রতিভ ভাবে টালটা সামলায় বাদল।

তা শোনাটা অবশ্য কিছু বিচিত্র নয়। তেমন কিছু বাড়িয়েও বলেনি বাদল। মেকানিক্যাল আর মেটালার্জি দুটো বিষয়ে ফার্স্ট ক্লাস, চৌখস ক্রিকেট খেলো-য়াড়, ইউনিভার্সিটি ব্লু মিঃ মেহতা এই নতুন কারখানার জয়েন করতে আসছেন এটা অনেকেরই আলোচনার বিষয় ছিল শিক্ষানবিশ মহলে। মিঃ মেহতাই হবেন বাদলের ডিপার্টমেণ্টের বস। এটা নিয়ে বেশ একটু ভীতিমিশ্রিত কৌতূহলও ছিল তার। আজ এইভাবে হঠাৎ মুখোমুখি না হয়ে গেলে এত সহজে হয়তো কথাগুলো বলতেও পারত না সে।

নিজের কথা শুনতে মিঃ মেহতার আগ্রহ বোধ হয় একটু বাড়ল। সামনে আরো খানিকটা ঝুঁকে পড়ে শুধোলেন,

কি শুনেছ আমার কথা?

এবার বাদল একটু আমতা আমতা করে। নানাজনে নানারকম বলে। তার কোনটার কতটা বলা উচিত হবে বুঝে উঠতে না পেরে মাথা চুলকায় সে। মিঃ মেহতা সারা ঘরটা কাঁপিয়ে হেসে ওঠেন, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড—খুব খারাপ বলে।

বাদল প্রতিবাদ করতে গিয়ে আবো খেই হাবিয়ে ফেলে। মিঃ মেহতা নিজের কথার জের টেনে বলে চলেন, আমি ভাই লোকটা রিয়েলি খারাপ—ভেরি ব্যাড, কাজ না করলে আমি ভেরী ব্যাড। মাইণ্ড ইউ। আই ক্যান ডু নো গুড টু ইউ, বাট ক্যান ডু এ লট অফ ব্যাড।

ছোট কারখানা, সবে মাত্র কাজ স্বরু করেছে। প্রায় বারো আনা ভাগ এখনো কন্‌স্ট্রাকসনই হয়নি। শ' পাঁচেক লোক কোনরকম টিমটিমিয়ে সিকি ভাগ কারখানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে যা পারে করে। যখন তখন আসে, যখন তখন যায়।

মেহতার সেকশনে বাদলকে নিয়ে জয়েন করেছে মোট চারজন। সকালেই সবাইকে নিয়ে একবার স্বরু হয় রাউণ্ড। ফার্ণেসে যেখানে ইস্পাত গলছে—ঢালাই হচ্ছে, মেহতার পিছন পিছন খাতা কলম হাতে দেখা যাবে চারজনকে। মেহতা এক একটা জিনিস দেখায় আর জিজ্ঞেস করে—

লাইম্‌টা কোন কাজে লাগে বলতো দেখি?

কিংবা—

ফার্ণেসের টেম্পারেচার কত মেপে দে তো।

ওরা পারলে বলে, নাহলে মেহতা বুঝিয়ে দেয়। পরম ধৈর্য আর অধ্যবসায় নিয়ে চারটি শিষ্যকে যেন তালিম দেবার ভার নিয়েছে অধ্যাপক। ইতিমধ্যে

কখন যে তারা 'তুমি' থেকে 'তুই' এ নেমে এসেছে খেয়ালই করেনি কেউ।

দুপুরটা কাটাতে হবে লাইব্রেরীতে। চারজন চারটে বই হাতে খোশ গল্প করে, নোট নেওয়ার বদলে ছড়া কাটে মেহতার নামে। বাইরে গ্রীষ্মের ঝাঁ ঝাঁ রোদ। খাওয়া দাওয়ার পর ঠাণ্ডা ঘরে একটু বসলেই চোখে জড়িয়ে আসতে চায় ঘুম। কিন্তু তার কি জো আছে? খানিক বাদেই শোনা যাবে লাইব্রেরীর মেঝে কাঁপিয়ে মেহতার ভারী বুটের খটখট আওয়াজ। চারজনের ঘুম ছুটে যাবে তাড়া খেয়ে। চমকে উঠে হাতড়াতে থাকবে যে যার বইয়ের হারানো চিহ্ন। ইস্পাত তৈরীর কলাকৌশল ছাড়া যেন এই মুহূর্তে তাদের কাছে আর কিছু জিজ্ঞাস্য নেই।

মাঝে মাঝে মহাবিরক্ত হয়ে ওঠে চারজনাই। একি জ্বালারে বাবা! কারখানায় চাকরি তবু বইএর হাত থেকে অব্যাহতি ঘটল না। এত জেনেই বা কি হবে? যত সব বাড়াবাড়ি।

একদিন দুপুরে কাউকে কিছু না বলে, কেটে পড়েছে তিনজন। চতুর্থ জন ছিল হাজিরার ব্যাপারটা ঠিক করার জন্য। পাছে মেহতার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যায় এই ভয়ে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু ক্যান্টিনে চায়ের কাপ হাতে ধরা পড়ে গেল।

—কিরে তুই একলা যে? ওরা কোথায়?

—ওরা ওরা··· , ঝট করে মিথ্যা বলতে না পেরে মাথা চুলকোয় বেচারা।

—হুঁ,

আর একটি কথাও না বলে মেহতা চলে গেলেন সেখান থেকে।

পরের দিন সবাই এ ওর মুখের দিকে তাকায়। একি! তিনজনের দুপুর থেকে চারঘণ্টার মাইনে খতম। সকলের মুখ কালো হয়ে আসে। একি জুলুম! কাজে ফাঁকি দিলেও না হয় কথা ছিল! লাইব্রেরীতে বসে তো বই নিয়ে পড়া পড়া খেলা। একটা দিন না হয় বাদই গেল।

অনেকরকম মতলব ভাঁজা হোল। কেউ বলল, মেহতাকে বেশি খাতির দেখাতে গিয়েই বারোটা বেজেছে। এতবড় আস্পর্ধা, সকলকে 'তুমিও' নয় একেবারে তুই! কেন, এটা অফিস নয়? তারা কি মেহতার ইয়ার দোস্ত্? আরো নানা কথা উঠল। মেহতাকে জব্দ করার নানান ফন্দি বাতলালো নানাজনে। কিন্তু মুস্কিলটা বাধল, কথাটা কে শুরু করবে তাই নিয়ে।

পরদিন যথারীতি খাতা পেন্সিল হাতে চারজন চলেছে মেহতার পিছনে। কিন্তু অন্যদিনের সেই ছন্দটা আজ কোথায় যেন কেটে গেছে।

টুকটাক দু' একটা কথা ছাড়া সকলেই প্রায় নির্বাক। চারজন এ ওকে কনুই দিয়ে গুঁতোয়। মেহতা আঁটসাঁট খেলোয়াড়ী ভঙ্গীতে বুট খটখটিয়ে চলে। তার দিক থেকেও আজ অন্যদিনের সেই হাস্যোজ্জল ভঙ্গীটি একেবারে অনুপস্থিত।

সুযোগ একটা জুটে গেল হাতের কাছেই।

ঢালাইএর ছাঁচগুলো পরিষ্কার করার জন্য এখানে একটা ওয়াটারজেট লাইন আছে। ভাল্‌ভ খুলে দিলেই পাইপের মুখ দিয়ে তীব্র বেগে জল ছুটতে থাকে। কাজ শেষ হয়ে গেলে সেটা বন্ধ করে দেওয়াই নিয়ম। মেহতার হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, জেটটা খোলা পড়ে আছে। কাছাকাছি লোকজন কেউ নেই। হয়তো যে এখানে কাজ করছিল, তারই অবহেলার ফল এটা। জল গড়িয়ে গড়িয়ে মেঝেটা অনেকটা ভিজিয়ে ফেলেছে। এদিকে একটু দূরে জমা করা আছে চুনের গুঁড়ো। জলটা গড়াতে গড়াতে এগোচ্ছে সেদিকেই। মেহতা বাদলকে বললেন, ভালভটা চট করে বন্ধ করে দিয়ে আয়তো।

অভ্যাসবশে বাদল খানিকটা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এল। গলায় বেশ খানিকটা দৃঢ়তা এনে বলল, মিঃ মেহতা, এটাও কি আমাদের কাজ?

বিস্মিত মেহতা মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ। তিনজন হেঁটমুখে নির্বাক! মেহতা নিজেই ভালভ্‌টা বন্ধ করলেন, তারপর আবার ফিরে এলেন চারজনের মাঝে। ফর্সা মুখ টকটকে লাল হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

—মাইণ্ড ইউ, ইট ইজ ইয়োর জব, এভরি বডি'স জব।

বাদলেরও জেদ চেপে গেছে। বলে, আপনি আমাদের যা খুশী করাবেন, আর আমাদের মাইনে কাটবেন, এ চলবে না।

—হোয়াট! তুমি ডিউটি ছেড়ে পালাবে, অ্যাণ্ড ইউ য়োণ্ট পে ফর ইট?

সেদিন দুপুরে লাইব্রেরীতে চারজনে বই নিয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে বসে রইল, কিন্তু মেহতার বুটের ভারী আওয়াজ একবারও শোনা গেল না।

একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে গেল।

কারখানার কাজ শুরু হয়েছে অনেকগুলো ওয়ার্কশপে। বাদলরা চারজন ভাগাভাগি হয়ে পোস্টিং হয়ে গেল চার জায়গায়। মেহতা একটা প্রমোশন পেয়ে উঠে গেলেন আর একধাপ ওপরে। এখন তাঁর সঙ্গে দেখা হয় দিনে

একবার শপে শপে সকালে রাউণ্ড দেবার সময়। তেমনি হাসি খুশী, তেমনি উন্নত চেহারা। শপে গিয়ে ঝাঁকিয়ে গল্প করেন, খোঁজখবর নেন।

বাদলরাও এখন অনেক কিছু শিখেছে। মেহতার সঙ্গে কথা বলার সময় মাটির দিকে তাকিয়ে থাকে না, সমানে তর্ক করে। মেহতা কিছু মনে করেন না। কিন্তু রাজনীতির কথা এলেই মেহতা যেন ক্ষেপে যান। আর যে কোন কথা গড়াতে গড়াতে যেন এখানেই আসবে।

সারা দেশে সে বছর অটোমেশন আমদানীর বিরুদ্ধে জোর আন্দোলন। খবরের কাগজে পক্ষে বিপক্ষে নানান আলোচনা। আলোচনার ভিতরে মেহতারা ঢুকে পড়েছেন একদিন। মেহতা বলেন, অটোমেশন তো সব ডেভলডপ্ দেশেই চালু আছে—কই কোন ক্ষতি তো কারুর হয়নি।

—কিন্তু আমাদের দেশ তো ডেভলপড্ কান্ট্রি নয়, গরীবদের দেশ এটা। আমরা খেতে পাই না, আমাদের অটোমেশন কি হবে?

—ইনডাসট্রির ভেতর অটোমেশন না এলে ইনডাসট্রি কোনদিন ডেভলপ করবে না। দিস ইস অ্যান এক্সট্রিম নেসেসিটি।

গলার এক পর্দা চড়ায় এবার বাদল, ইনডাসট্রি ডেভলপ করার জন্য এসব থোড়াই করছে, করছে শ্রমিক ছাঁটাই করে লাভের অঙ্ক বাড়াবার জন্য।

মেহতাও আস্তিন গুটিয়ে টেবিলে ঘুষি মারেন, তোরা সব জিনিসটাকে নেগেটিভ সাইড থেকে বিচার করবি। দিস ইস নো গুড। ধরে নিলাম, অটোমেশন হলে কিছু লেবার ছাঁটাই হবে, অন দি আদার সাইড অটোমেশন ইনডাসট্রিও কিছু লোককে কনজিউম করবে—দেন?

বিজেতার ভঙ্গীতে তাকায় মেহতা।

তর্ক বেড়ে চলে। একজনের যুক্তিজাল ছিঁড়তে চেষ্টা করে আরেকজন। পাশাপাশি অনেকে দাঁড়িয়ে মজা করে। কেউ কেউ অংশগ্রহণ করতেও এগিয়ে আসে। স্বভাবতই বাদলের পক্ষে লোক দাঁড়িয়ে যায় বেশী। আস্তে আস্তে যুক্তির স্থান দখল করে গলার জোর। মেহতার ফর্সা মুখ লাল হয়ে আসে। টেবিলে চটপট ঘুষি পড়ে। তারপর একসময় উভয় পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আবহাওয়ায় তিক্ততার গন্ধ পাওয়া যায়। তখন মেহতা উঠে সকলকে দুহাতে ঠেলতে ঠেলতে বলেন, চল ক্যান্টিনে চা খেয়ে আসা যাক।

এই খেলোয়াড়ী ভঙ্গীটার জন্যই মেহতাকে সকলে পছন্দ করে। ভিন্ন ডিপার্টমেণ্টের লোকেরাও মেহতা বলতে এক ডাকে চেনে। কারখানায়

কাজেব ব্যাপারে নানারকম খিটিমিটি লেগেই থাকে। কিন্তু এখানে খিটিমিটি-গুলো তেমন বড় হয়ে দানা বাঁধতে পারে না। তার কারণ মেহতার ঐ স্বভাব। যদি শ্রমিক পক্ষের দোষ থাকে তার জন্য তিনি কঠোর। কিছুতেই মাথা নোয়াবেন না। আর যদি নিজের দোষ থাকে, যদি বুঝতে পারেন, তৎক্ষণাৎ শুধরাতেও পিছপা হবেন না। তেমন তেমন ক্ষেত্রে উপরওয়ালাদের সঙ্গে ঝগড়াও করেছেন বহুবার বাদলদের পক্ষ নিয়ে। তাঁর ঐ এক গোঁ—এই সম্পত্তি দেশের সম্পত্তি। কারুব এখানে কোন অন্যায় করার অধিকার নেই।

যতদিন যায় কারখানার কাজ বাড়ে, বেড়ে চলে কাজের জটিলতা। কত রকমের ইস্পাত—বকমারি আকৃতি আর প্রকৃতি। কেউ যাবে মোটর কার-খানায়, তো কেউ যাবে নাট-বল্টু তৈরীর ঝুপড়িতে। কারুর কাজের জন্য চাই নরম ইস্পাত, কারুর চাই কড়া। বাদলের কাজের মধ্যে দায়িত্বেব ছাপ এসে দাগ কেটেছে মুখে। ঘন ঘন এধার ওধার ফোন করে খুঁটিনাটি খবর নিতে হয় তাকে মাল ওয়াগনে বোঝাই হবার আগে। দরকার মত সব কিছু টেস্ট উৎরেছে কিনা এই সার্টিফিকেট দিতে হয় তাকে। তাব কাছ থেকে ছাড পেলে তবে মাল বাইরে যাবার অনুমতি পায়।

সেবার সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে হঠাৎ কি যে হাওয়া পড়ল, ঘরে ঘরে লোক পড়ল অসুখে। হাসপাতালে উপচানো ভিড়। কারখানার ডিপার্টমেন্টে ভীতিজনক গরহাজিরী। সকাল থেকে শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছিল বাদলের, তবু সহকারীটি অসুস্থ বলে বি-শিএ্টে তাকে ডিউটিতে আসতে হোল। দুপুর দুটো থেকে রাত দশটা।

একগাদা কাগজ সার্টিফিকেটের অপেক্ষায় পড়ে আছে। বাদলের শিফট-ইনচার্জ মিঃ ঘোষের মেয়ের জ্বর। খবর পাঠিয়ে দিয়েছেন আসতে পারবেন না। দেখেশুনে প্রথম থেকেই খিঁচড়ে গেল বাদলের মেজাজ। পনের মিনিট পর থেকে শিপিংডিপার্টমেন্টের ঘন ঘন ফোন আসতে শুরু করল।

: মিঃ মিত্র নাকি? ওয়ার্ধা মেটাল ওয়ার্কের মালটা ছেড়ে দিন। ট্রাক নিয়ে এসেছে ওরা। এক্ষুণি মাল ডেলিভারী নেবে।

: রিফাইনারির অর্ডারটার কি পজিসন বলুন তো মিঃ মিত্র।

: কি ব্যাপার মশায়—মেটালফ্যাক্টরির, সার্টিফিকেটটা এখনো ছাড়েননি? আপনারাই দেখছি সব ডোবাবেন!

বাদল কাগজের পাহাড খানিক হাঁটকাল। দু'চারবার ফোন করল এধার ওধাব। কাউকে পেল, কাউকে পেলনা। যাকে পাবার কথা সে নেই, যে ফোন ধবল সে কোন খবব দিতে পারলনা। সময় যত পেরিয়ে যায় বাদল ক্রমশঃ অস্থিব হয়ে পডে। ভিতবে ভিতবে ইঞ্জিনেব মত ঝপ ঝপিযে একটা কাঁপুনি বাডতে থাকে। বাদল বেশ বুঝতে পাবে তাব জ্বব আসছে।

অনেকক্ষণ পব কাঁধে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে জেগে উঠল সে। চোখ টকটকে লাল। চুলগুলো এলোমেলো কাঁপুনিব চোটে দাঁতে দাঁতে শব্দ উঠছে খটাখট।

—হোযাট্স ইট্? ডক্টবেব সঙ্গে দেখা কবেছিস?

অ্যাম্বুলেন্স ডেকে বাদলকে হাসপাতালে পাঠিয়ে মেহতা নিজেই বসলেন তাঁব চেযাবে।

কাগজেব পাহাড়! রকমাবি ফাইল—কেউ ড্রয়াবে, কেউ আলমারিতে কেউ বেঁটে ক্যাবিনেটে। মিঃ মেহতাব কাছে ব্যাপাবটা যে নতুন তা নয়, কিন্তু দীঘ অভ্যাসের ফলে কাজেব যে সাবলীলতা জন্মায় তা তো তাঁর নেই। প্রতিটি খুঁটিনাটি—ক্রমান্বয় বক্ষা কবতে গিয়ে মেহতা হিমসিম খেতে লাগলেন। যত সহজে সবকিছু কবে ফেলবেন ভেবেছিলেন তত সহজ নয় কাজটা, তবু মেহতাব সহজাত প্রাণশক্তি আব অদম্য আত্মবিশ্বাস তাঁকে চেয়ারে ধবে রাখল একনাগাডে বাত দশটা অবধি।

একাগ্রতা আব আত্মবিশ্বাস অনভ্যাসেব ব্যাধিটা অনেক দূব করলেও সবটা পাবলনা। ফাঁকতালে ঢুকে পডল, ভুল তো ভুল, একেবারে মারাত্মক ভুল। বিফাইনাবিব জন্য নির্দিষ্ট করা মাল সার্টিফিকেট পেয়ে বেবিয়ে গেল হার্ডনেস বিপোর্ট ছাডাই।

সে ভুল ধবা পডল মাসখানেক বাদে।

বাদল বেশ কিছুটা ওজন কমিয়ে ফিরে এসেছে। কাজকর্ম চলছে যথারীতি। এমন সময় এসে গেল রিফাইনারি থেকে চিঠি। যে মাল তাদের পাঠানো হয়েছে তা কাজের অযোগ্য, হার্ডনেস অনেক বেশি। মাল তারা ফেরত পাঠাচ্ছে।

স্বাভাবিক ভাবে ডাক পড়ল বাদলের। বহু টাকার প্রশ্ন জড়িত। তাছাড়া এমন মারাত্মক ভুল হোল কি করে?

মেহতার মুখ গম্ভীর। 'ইউ মাস্ট এক্সপ্লেন ইট', কটমট করে তাকিয়ে বললেন বাদলকে। বাদলের মুখ ভয়ে এতটুকু। কি করে এমন হোল তার মাথা মুণ্ডু খুঁজে পায়না সে।

ব্যাপারটার হদিশ পাওয়া গেল অবশেষে। সার্টিফিকেট সেদিন ইস্যু হয়েছিল সে তারিখ পাওয়া গেল। বাদল মুখ উজ্জ্বল করে বলল, সেদিন তো আমার জ্বর মিঃ মেহতা। আপনি আমাকে হাসপাতালে পাঠালেন।

বাদলের ঠিক উপরের ধাপের অফিসার ঘোষ মশায় চশমার ফাঁকে একবার মেহতা একবার বাদলের দিকে তাকিয়ে মন্তব্য করলেন, কিন্তু পাঁচটা অবধি তো আপনার সেদিনের অ্যাটেনডেন্স হয়েছে মিঃ মিত্র। তার মধ্যে আপনিই যে এই সার্টিফিকেট ইস্যু করেননি তার প্রমাণ কি? নাকি মিঃ মেহতা? আমি অবশ্য সেদিন ছুটীতে।...

মিঃ মেহতা নিঃশব্দে উঠে গেলেন। কয়েকমিনিট পরই তাঁর স্কুটারের ফট্‌ফট্‌ শুনতে পাওয়া গেল।

॥ মেহতার ডায়েরী ॥

আই অ্যাম ইন্ দি স্ন্যপ! আই অ্যাম ইন দি গ্রেট স্ন্যপ! (বড় বড় অক্ষরে) আমার একটা ভুলের ফল ভোগ করতে যাচ্ছে একটি নির্দোষ ছেলে। একে তো ভুল করেছি তার যন্ত্রণা আছে তার থেকে বড় যন্ত্রণা সে ভুল স্বীকার করার সুযোগ পর্যন্ত পাচ্ছি না। ব্যাপারটা চীফ্ বস্‌কে আমি যেই বললাম, বিরক্তিতে কুঁচকে গেল তার মুখ। টেবিলের উপর থাবড়া মেরে নির্দেশ দিল আমাকে—শাট ইয়োর মাউথ। এ বস্ ক্যান ডু নো রং।

বললাম, সমস্ত চার্জ নিতে আমি প্রস্তুত আছি।

উনি ধমকালেন, এটা বদান্যতার প্রশ্ন নয়-প্রশ্নটা প্রেস্টিজের।

কার প্রেস্টিজ, কিভাবে সে প্রেস্টিজ রক্ষা করা যায় সে সব প্রশ্ন ওনার কাছে না তোলাই ভালো। কিন্তু যে নির্দোষ ছেলেটি, যার নাম বাদল, আমার প্রেস্টিজ বাঁচাতে যদি তার চাকরি যায় তবে আমার পক্ষে তা কতটা প্রেস্টিজের ব্যাপার থাকবে বলা দায়!

আমি বলতে চেষ্টা করলাম, দোষটা যে করেছে শাস্তিটা তারই প্রাপ্য।

'বসে'র মুখে আমি স্পষ্ট রাগের চিহ্ন দেখতে পেলাম। হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, মেহতা ডোণ্ট বি এ সেন্টিমেণ্টাল ফুল!

—তা হলে ওর অপরাধটা ক্ষমা করা হবে কথা দিন।

—চিন্তা কোরোনা। আইন তার নিজের রাস্তায় চলবে।

তার মানে ওকে বাঁচাবার আর কোন পথ খোলা রইলনা।

তার মানে, আমি, মেহতা, মিঃ মেহতা হয়ে, আমার এই সাজানো কোয়ার্টার, কারখানাজোড়া সুনাম, বছর বছর প্রমোশন আর নানারকম উজ্জল স্বপ্নালী ভবিষ্যৎ সহ স্বচ্ছন্দে বেঁচে রইলাম। আইন আমাকে ছুঁতে পারবে না। না, না, দ্যাট আনফরচুনেট চ্যাপ! ও ও পারবেনা আমার সুনামের উপর, কারখানার তাবৎ এক্সিকিউটিভ কুলের উপর কোন কলঙ্ক লেপন করতে।

চার্জটা মাথা পেতে ওকে নিতেই হবে। অকাট্য প্রমাণ কোম্পানীর হাতেই রয়েছে। জাল ছিঁড়ে পালাবার কোন পথ ওর খোলা নেই। আর সেই জালের দড়িগুলোকে শক্ত করতে ভার হয়তো নেবেন আমার চীফ্ বস্ স্বয়ং, সাহায্য করতে স্বেচ্ছায় হয়তো এগিয়ে আসবেন মিঃ ঘোষ। এমন কি আমারও ডাক পড়তে পারে। হয়তো ওর চার্জশীটটা সই করতে হবে আমাকেই। বিচারের জন্য যে বোর্ড হবে, সেখানে গম্ভীর গম্ভীর মুখে হয়তো বসেও থাকতে হতে পারে।

আচ্ছা, এখন এই রাত দুটোর সময়েও আমার চোখে ঘুম আসছে না কেন? হাতের তালুতে মনে হয় ঘাম হচ্ছে, নয়তো ডায়েরীর লেখাগুলো এমন ছেবড়ে ছেবড়ে যাচ্ছে কেন? আমার বাবার মুখ বার বার মনের মধ্যে ভেসে ভেসে উঠছে কেন?

আচ্ছা, ঐ যে পাশের ঘরে সুদৃশ্য খাটের উপর ফর্সা বিছানায় গা ডুবিয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে আমার বউ, ওকে যদি এখন ঠেলা দিয়ে তুলে দিই, তারপর ওর আলুথালু মুখের একপাশে মুখ নিয়ে গিয়ে কানে কানে বলি—জানো, কাল থেকে আমার আর চাকরি নেই, ও কি বলবে? বিশ্বাসই করবেনা। টুস করে আবার শুয়ে শুয়ে বলবে, রাত দুপুরে পাগলামি কোরোনা

বাদল কি বিয়ে করেছে নাকি? কি জানি এই মুহূর্তে আমার মনে পড়ছে না। কোথায় যেন ও থাকে? না তাও মনে পড়ছে না। অবশ্যি আমি

কখনো ওর বাসায় যাইনি। ওর বাসায় কি এই রকম নীল বাতি আছে—মিষ্টি মিষ্টি, নরম নরম। এই রকম খাট ওর বাড়িতে নিশ্চয় নেই এ আমি দিব্যি করে বলতে পারি। কারণ আমার শ্বশুর মশায় স্পেশ্যাল অর্ডার দিয়ে তৈরী করিয়ে ছিলেন এটা। তিনি আবার মস্ত বড ব্যবসায়ী কিনা, অনেক টাকার মালিক! এমন খাট অবশ্য আমার বাবা সিরিকান্ত মেহতাও কখনো চোখে দেখেনি। মহারাষ্ট্রেব যে ইস্কুলে তিনি ছেলে পডাতেন—অর্থাৎ আমিও যেখানে ছোট বেলায় পডাশুনা কবেছি সেই ইস্কুলটা মনে পডছে আমাব, বেশ বড সড় সাদা রঙের বাড়ি ছিল সেটা। ঠিক গেটটার কাছেই ছিল একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। কে লাগিয়ে ছিল কে জানে! কিন্তু এতদিন পব আমার একটা হাস্যকর কথা মনে পডছে। গাছটার বিরাট গুঁডিতে ছুরি দিয়ে কেটে কেটে আমরা সব নিজের নাম খোদাই করতাম। এখনো আছে কিনা কে জানে !

আচ্ছা 'দোষী' কাকে বলে? যে দোষ করে তাকে—না যাকে সবাই আঙ্গুল তুলে 'দোষী' বলে ডাকে তাকে? সাক্ষী না রেখে যতখুশী পাপ করে যাও—কেউ কিছু বলবেনা। সাক্ষীটাই আসল। তা' না হলে তো এ পৃথিবীর প্রতিটা মানুষই দোষী—পোকায় খাওয়া আপেলেব মত। প্রতিটা সোজা বলকেই প্যাডে আটকানো যায়—শুধু আম্পায়ারের দৃষ্টি বাঁচিয়ে।

না এবার কলম থামাই। কি সব লিখছি—মাথামুণ্ডু নিজেই কিছু বুঝতে পারছি না। রাত বোধয় চারটে বাজল, কিন্তু আমার এখন ঘুমানো উচিত। ঘুম তো আসছে না। মাথায় কি জল দেব! শুনেছি তাতে কখনো কখনো উপকার হয়। আলোটা কি একটু নিবিয়ে দেব! আমার স্ত্রী আবার অন্ধকারে একদম থাকতে পারে না, কিন্তু আজ ওকে থাকতেই হবে। দিই বাতিটা নিবিয়ে।

*　　　*　　　*

পরদিন সমস্ত চার্জ নিজের ঘাড়ে নিয়ে রেজিগনেশন লেটার লিখে দিলেন মিঃ মেহতা! □

'দেরীতে হলেও ব্যাপারটা ভালোই', মন্তব্য করেছিলেন কয়েকজন। জঙ্গীপুর শ্রমিকসভার সংগঠন-সম্পাদক এবং কার্যকরী সমিতি কারখানার ভেতর যে যথেষ্ট উদ্দীপনার সৃষ্টি করতে পেরেছেন ব্যাপারটা নিয়ে তারও প্রমাণ পাওয়া গেল। ছোট বড় মাঝারি প্যাডের কাগজে সাইক্লোস্টাইল করা ফরমের উল্টোপিঠে বা ঐরকম কিছুতে লেখা গাদাগাদা গল্প জমা পড়তে লাগল সংগঠন সম্পাদকের অফিসে। জঙ্গীপুরের শ্রমিক বহু পোড়খাওয়া, আন্দোলনের উত্তরাধিকারসম্পন্ন। তাঁরা যে কলম চালাতেও এমন ওস্তাদ কেউ ভাবেনি আগে সে কথা। তবে হ্যাঁ, লেখকেরা কেউই প্রতিষ্ঠিত নন, আর লিখেওছেন একেবারে সাদামাটা। তাঁদেব চারপাশে যা দেখেন সেই অবিকৃত অভিজ্ঞতার কথা, ফার্নেস আর উত্তাপের কথা, আন্দোলনে কর্মরত ঘর্মময় শ্রমিকদের কথা। ভাষার মারপ্যাচ নেই বলে 'হ্যাঁ' কে 'না' করতে পারেন নি বটে, তবে জিনিসটি তৈরী করছেন চমৎকার।

সংগঠন-সম্পাদক সহকারীদের নিয়ে প্রতিটি লেখা পড়েছেন, আলোচনা করছেন, জায়গায় জায়গায় দাগ দিচ্ছেন লাল কালিভরা কলমে, প্রতিটি লেখার বক্তব্যের লাইন সঠিক কিনা আলোচনা করছেন, ভুল থাকলে পাশে নোট লিখেছেন। মোট কথা, নাওয়া খাওয়ার সময় নেই তাঁর ব্যস্ততায়। আগামী মে দিবসে এই সঙ্কলন গ্রন্থখানি জঙ্গীপুর কারখানার শ্রমিকদের হাতে পৌঁছে দিতে চান তিনি। বহু সহযোগী সংস্থাকে জানিয়েও দেওয়া হয়েছে সঙ্কলনের কথা। তাঁরা কে কতখানি দায় দায়িত্ব নেবেন তার ছকও মোটামুটি প্রস্তুত। কেন্দ্রীয় শ্রমিকসভার প্রতিভা-অনুসন্ধান-কমিটির চেয়ারম্যান ডঃ বোস নিজে উৎসাহ প্রকাশ করেছেন এ ব্যাপারে।

ও দিকের কাজ সবই তৈরী, শুধু লেখাগুলো বেছে তোলটাই যা বাকি।

কাজ খুব ভালই এগোচ্ছিল। হঠাৎ পড়তে পড়তে একটা গল্পে এসে থমকে

গেলেন সম্পাদক। গল্পটির 'খাঁচা।' ছোট দু'পাতার গল্প। একজন শ্রমিক দিনের শেষে কাজ সেরে কারখানা থেকে বাসায় ফিরেছে। নববিবাহিতা বধূ সারাদিন সময় কাটিয়েছে শুয়ে বসে। জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে তাকিয়েছে সে বহুবার দূরের অজস্র চিমনিখচিত কারখানার আকাশের শিল্যুট ছবির দিকে। হয়তো বা নিজের অজান্তে দুফোঁটা চোখের জলও মুছেচে। প্রতিদিনকার এই নিরুপায় একঘেয়েমি ভাল লাগেনা তার। কখন স্বামী আসবে তার জন্য সে প্রহর গোনে। লোকটি যখন ফিরল বাড়িতে তখন বিকেল। দেখল কলে জল আসেনি সারাদিন। খালি চৌবাচ্চায় একমগ জলের জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করল সে' তারপর খানিকক্ষণ গজগজ করল। অবশেষে রাগ করে বেরিয়ে গেল বাজারের থলি হাতে। বাড়ি ফেরার পর সেই যে বিছনায় শু'ল খেতে ডাকার আগে পর্যন্ত উঠল না। মেয়েটি রান্না করল, স্বামীকে খাওয়াল। নিজে খেল। তারপর বিছানার পাশে একচিলতে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল কেমন একরকম ধোঁয়াশায় ছেয়ে গেছে সারা আকাশ আর সেই আকাশের গায়ে আটখানা চিমনি যেন বিশাল হাত হয়ে অক্টোপাশের মত ছুটে আসছে তার গলা লক্ষ্য করে।

ব্যাস এই গল্প। অত্যন্ত সাদাসিধে ভাষা, অনাড়ম্বর বাঁধুনি, কিন্তু কোথায় যেন ক্ষীণ একটা বিষাদের সুর। ছবিগুলি অস্পষ্ট, কিন্তু বাঙ্ময়। পড়া হয়ে গেলে কি যেন একটা চুরি হয়ে যচ্ছে চুরি হয়ে যাচ্ছে এইরকম অনুভূতি হয়। আবার আগাগোড়া গল্পটা পড়লেন সম্পাদক, তারপর কোন মন্তব্য না করে পাশের একজন সহকারীকে দিলেন। সে পড়তে শুরু করার দু'মিনিটের মধ্যেই তলিয়ে গেল। সে আবার তার পাশের একজনকে দিল পড়া হয়ে গেলে। এমনি করে সকলের পড়া হয়ে গেল গল্পটি, কিন্তু কেউ কিছু মন্তব্য করল না।

সঙ্কলনের গল্প পছন্দের কাজ মোটামুটি শেষ। এমন সময় হঠাৎ খবর এল ডঃ বোস নিজে আসছেন একবার লেখাগুলি দেখতে। তরুণ শ্রমিকদের সাহিত্য-ভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে চান তিনি। জগদ্দীপুর শ্রমিক সভায় সদস্যদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল একটা। ডঃ বোস, রোগা ছোটখাটো মানুষ। সেই ইংরেজ আমল থেকে 'রাজনৈতিক সাহিত্য করার অপরাধে কতবার জেলে গেছেন তার ঠিক নেই। তবু তারই ফাঁকে ফাঁকে লিখে গেছেন। তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাস, গল্প ও কবিতা শ্রমিকশ্রেণীর সাহিত্যে এক একটি উজ্জল হীরক খণ্ডের মত। তাঁর কয়েকটি উপন্যাস আন্তর্জাতিক খ্যাতিও পেয়েছে।

যাই হোক স্বল্পভাষী ডঃ বোস যথাসময়ে পৌছলেন। খুব ভারী ভারী আর তেজী। গত আগস্ট স্ট্রাইকের ওপর গোটা চারেক লেখা পড়তে দিলেন তাঁকে সংগঠন সম্পাদক। প্রত্যেকটি লেখার বাঁপাশে ডানপাশে ঠেসে ঠেসে পোরা আছে লাল কালিতে লেখা তাঁর মন্তব্য। ডঃ বোস খুব মনোযোগ দিয়ে পড়তে লাগলেন গল্পগুলি। কখনো খুব মৃদু ত্ব'একটি প্রতিবাদ করলেন, কখনো উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন গল্পেব কোন জায়গায়। তারপর আরো লেখা চাইলেন।

'এ দের এই শিল্পগত দিকটা তুলে ধরবার জন্য আপনারা নিশ্চয়ই প্রশংসা পাবেন' বললেন ডঃ বোস, 'আব এদেব লেখাও খুব সুন্দর, খুবই সুন্দর বলতে হবে। এত অল্প কথায় একেবারে নির্ভেজাল ছবি এঁকেছেন।'

কোন বিশেষ লেখা সম্পর্কে তাঁর মতামত অবশ্যই তিনি বললেন না। কিন্তু সম্পাদক ও সহকাবীবা গভীব আগ্রহে লক্ষ্য করছিলেন তাঁর চোখ ত্নটির ঘোবাফেবা, চশমা খোলাপরা, চশমার কাচ মোছা—এই বকম নানান খুঁটিনাটি। পডতে পড়তে কখনো পড়া বন্ধ করে কী ভাবেন, কিংবা স্রেফ আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকেন। সম্পাদক একবার আড়চোখে তাকিয়েই দেখেন যে গল্পটি পডা হচ্ছে তাব নাম 'খাঁচা'। গল্পটি সম্পর্কে তিনি নিজেও বলতে গেলে, কেমন সন্দিহান ছিলেন। গভীর আগ্রহে ডঃ বোসের দিকে লক্ষ্য বাখলেন তিনি কিছু মতামত দেন কিনা। পড়া হয়ে গেলে ডঃ বোস গোডা থেকে আবার শুরু করলেন পড়তে। তাঁব কপালে একটির পর একটি ভাঁজ ফুটে উঠতে লাগল। তারপব ঝাডা দশ মিনিট পর যখন তিনি পরবর্তী গল্প পডতে শুরু করলেন তখন দেখা গেল অন্যমনস্কতাহেতু হাতের ডট্‌পেন দিয়ে কাগজের মার্জিনের সাদা অংশে কয়েকটি বৃত্ত আঁকা ছাড়া আর কিছুই তিনি বলেননি!

ডঃ বোস চলে যাবার পর স্বভাবতই গল্পগুলির পুনর্বিবেচনা করার প্রয়োজন হয়ে পডল। যদিও তিনি প্রত্যক্ষভাবে কিছু বলে যাননি, তবু যতদূর স্মৃতিতে থাকা সম্ভব, ডঃ বোসেব ভুরু কোঁচকানো, চশমা খোলা এবং অনুরূপ উপসর্গ দ্বারা যতটুকু বোঝা যায় সেই আলোকে আবার বিবেচনা শুরু হোল।

পড়তে পড়তে আবার আটকে যেতে হোল সেই 'খাঁচা'র কাছে এসে। এখানে ওখানে ছডানো বিচ্ছিন্ন কয়েকটি বৃত্ত। কোথাও জডাজডি, কোথাও একক। দেখতে দেখতে মাথা গরম হয়ে উঠল সম্পাদকের, 'এই হতচ্ছাডা চিহ্নগুলোর মানে বলুন দেখি?' বলতে বলতে এগিয়ে দিলেন সহকারীর দিকে।

'এর মানে তো খুবই সোজা। ডঃ বোস যে এই মন্তব্যই করবেন এ আমি আগেই জানতাম।'

'কী জানতেন?'

লেখক প্রচলিত বুর্জোয়া ধ্যান-ধারণা থেকে একচুলও উঠতে পারেনি। শুধু তাই নয় লেখার ক্লাইম্যাক্স পয়েণ্টে লেখক এমন এক জঘন্য মববিডিটি আর ফ্রাসট্রেসনের শিকার হয়েছেন যা লিখতে কোন মধ্যবিত্ত প্রগতিশীলেরও কলম কেঁপে উঠত।'

রেগে উঠলেন সম্পাদক, 'আগে যদি বুঝতে পেরেছিলেন তো এ লেখাটা ডঃ বোসের কাছে দেওয়া ঠিক হয়নি আপনার। ছিঃ ছিঃ! ড. বোস কী ভাবলেন আমাদের সম্বন্ধে ভাবুনতো। এসব বিঅ্যাকসনাবি লেখা আউটবাইট রিজেক্ট কবে দেওয়া উচিত ছিল আমাদের।'

নিজের কৃতকর্মের সামান্য কৈফিয়ত হিসেবে সম্পাদক বললেন, 'তা যাই বলুন, ছোকরার হাতটি কিন্তু খাসা, স্টাইলটিও চমৎকার। আর শব্দ ব্যবহারের মধ্যেও বেশ বিচক্ষণতা আছে। এক একটি শব্দ তো নয় যেন এক একটি ছবি। তবে স্বীকার করতেই হবে ছোকরার শ্রমিকশ্রেণীর দর্শন সম্বন্ধে জ্ঞান একেবারেই নেই।'

'রাখুন মশায় আপনার স্টাইল, থিমেটিক কনটেণ্টে মালমসলা কিছু না থাকলে ঐ আপনার শাড়ি জডানো কলাবৌ-এব মত ব্যাপার হবে।'

'তা ঠিক, তা ঠিক।'

লেখক এবং লেখাটির ভবিষ্যৎ অন্ধকার হয়ে গেল।

যথাসময়ে মে দিবসের আগেই সঙ্কলনটি বেরিয়ে গেল। মাঝারি সাইজের পেপারব্যাক, দু'বঙা কভারের বইখানি হাতখালি বিধবার মত কী রকম যেন একটা সাত্ত্বিক আর সরলভাবে মণ্ডিত হয়ে একটা প্রলেতারীয় আউটলুক পেয়েছে।

ডঃ বোসের কাছে তাঁর কপি পৌছে দিতে গেলেন সংগঠন সম্পাদক নিজে। আর কয়েকটা ব্যাপারে একটু পরামর্শও নেবার আছে তাঁর কাছে। সে কাজটাও সেরে আসবেন একসঙ্গে।

ডঃ বোস খুশী। সংগঠন সম্পাদককে আন্তরিক অভিনন্দন জানালেন তিনি

এই প্রয়োজনীয় ব্যাপারটি বাস্তবায়িত করার জন্য। তারপর বইটির অঙ্গসজ্জা, কাগজ, ছাপা ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে ছোটখাটো কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি মন্তব্য কবলেন, তারপর বই-এব পাতা ওল্টাতে লাগলেন। সূচীপত্র থেকে শুরু কবে আস্তে আস্তে সমস্ত বইটা শেষ হয়ে গেলে আবার গোড়া থেকে উল্টে যেতে লাগলেন। মাঝে মাঝে দু'এক জায়গায় থামেন, একটু পড়েন, আবার ওল্টান। স্পষ্টতই মনে হোল তিনি কিছু খুঁজছেন, পাচ্ছেন না।

একটি লম্বা নিঃশ্বাস অবশেষে তাঁব বুক থেকে বেবিয়ে এল। তাবপব সম্পাদককে জিজ্ঞাসা কবলেন, 'কই সে লেখাটি তো দেখছি না—সেই যে একটি মেয়েকে নিয়ে, তাব বুকচাপা ক্লান্তি আব যন্ত্রণা নিয়ে। খুব জোবালো আর দবদী ভাষা—হ্যাঁ কি নাম যেন গল্পটিব, 'পিঞ্জব' না কি যেন আর লেখকেব নামটাও 'স্বাগত' না কি যেন, ঠিক মনে আসছে না। বুড়ো হওয়ার এই এক দোষ, কিচ্ছু মনে থাকে না।'

'ও, আপনি সুগত বায়েব কথা বলছেন,' অপ্রস্তুত মুখে বললেন সম্পাদক, 'ওর গল্পটাব নাম ছিল "খাঁচা"। খুব ভালো কর্মী আমাদেব শ্রমিকসভাব। তবে শ্রমিকশ্রেণীব দর্শনে জ্ঞানটা একটু কম, এই যা।'

'সব বুঝলাম, কিন্তু লেখাটা কোথায়?'

সম্পাদক হঠাৎ কী একটা খুঁজতে এমন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন যে ফিবে আসার আগে পর্যন্ত আব দেখা কবাব সময় পেলেন না।*

---

* একটি বিদেশী গল্পের ছায়াবলম্বনে লিখিত।

মানুষ, মানুষ

ডিউটি শেষ হবার ঠিক তিন ঘণ্টা আগে সুধাংশু গরম অ্যাসিড ভরা পিকলিং ট্যাংকের মধ্যে পড়ে মারা গেল। অনেক কষ্ট করে লাশ যখন তোলা হল, জায়গায় জায়গায় চামড়া খুলে গেছে। প্রাণের কোন চিহ্ন থাকতেই পারে না তবু নিয়মমাফিক হাসপাতালে ঘুরিয়ে লাশ নিয়ে যাবে পোষ্টমর্টেমে।

মনোবমার সঙ্গে সুধাংশুব বিয়ে হয়েছে মোটে এক বছর আগে। মনোবমাব এক দূর সম্পর্কের মাসী—থাকে তার সঙ্গে। দুপুবে খাওয়া দাওয়ার পর একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল আর এমন সময় দুঃসংবাদটা নিয়ে এসেছিল একজন। কড়া নাড়ার শব্দে মনোরমা ভেবেছিল বুঝি সুধাংশুই এসেছে, কিন্তু দরজা খুলে অন্ত লোক দেখে জিজ্ঞেস করল :

—কাকে চাই ?

—সুধাংশু বাবুর কোয়ার্টাব তো এটা ?

—হ্যাঁ, বলুন।

—দেখুন, উনি খুব অসুস্থ। কাবখানা থেকে আমবা ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে এসেছি—আপনাকে একটু যেতে হবে।

মুখে একটু দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ে মনোরমাব।

—কি হয়েছে ওর ?

—না, মানে সেটা ঠিক বুঝতে পারা যাচ্ছে না।

—আচ্ছা আপনি বসুন।

ভিতরের ঘরে গিয়ে মাসীকে তোলে সে, তারপর কাপড় টাপড় ছাডতে থাকে। বাইরে থেকে আগন্তুক হেঁকে বলে, শুনুন খুব তাড়াতাড়ি করুন বুঝলেন। আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি।

সময়টা দুপুর! ঘরে ঘরে কর্তারা কেউ বি-শিফটের ডিউটিতে চলে গেছেন,

নাইট-শিফটের যাঁরা তাঁরা ঘুমোচ্ছেন আর মর্নিং-শিফ্‌টের লোক তো এখন কারখানায়।

তবু গাড়ির শব্দে, ডাকাডাকিতে কৌতূহলী হয়ে ব্যালকনিতে ঝুঁকে দেখে কেউ কেউ।

মনোরমা শাড়ি ব্লাউজ পাল্টে, পাউডারে একটা হালকা ছোঁয়া দিয়ে বেরিয়ে আসে। তারপর মাসীকে নিয়ে দরজায় চাবি লাগায়। দু' একজন জিজ্ঞেস করে কোথায় যাচ্ছেন ?

মাসী উত্তর দেয়, বাবুর শরীর খারাপ, দেখতে যাচ্ছি।

তারপর সব সংসারে যা হয় তাই হোল। অনেক কান্না, হা-হুতাশ এবং মাথা ঠোকাঠুকির পর আবার সংসার যেমনকে তেমন চলতে লাগল। মনোরমাকে বাপের বাড়ি নিয়ে গেছে। সুধাংশুর বেকার ভাই হিমাংশু কারখানায় মাঝে মাঝে দাদার বন্ধুদের সঙ্গে দেখা করছে, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড, ডেথবেনিফিট স্কীম ইত্যাদির দরুন যে টাকা পয়সা পাওয়া যাবে তার তদারকির জন্য। হিমাংশুর পর দু'টি বোন। বড়টির বয়স পঁচিশ। অনেক দেখাদেখির পর তার বিয়ের ঠিকঠাক হয়েছিল। প্রথম ক'দিন খুব কান্নাকাটির পর অবস্থার গুরুত্ব বুঝে কান্না থামিয়ে পুরাতন সেলাইএর টিউশিনিগুলো আবার শুরু করেছে সে। বাবা কোনো কথাও বলেনা, কাঁদেওনা। মাঝে মাঝে শুধু শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে জানালায়। সুধাংশুর মা শুধু যখন তখন কাঁদে আর বৌমাকে উদ্দেশ্য করে কি যেন বিড়বিড় করে বকে পাগলের মত। বাবা, ছেলেমেয়েরা অনেকবার তাকে থামাবার চেষ্টা করে না পেরে এখন হাল ছেড়ে দিয়েছে।

হিমাংশুই খবরটা নিয়ে এল একদিন।

—জানো বাবা, সবিত দা বলছিল বৌদিকে নিয়ে যদি জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করা যায় তো বৌদির চাকরি হতে পারে একটা।

সবিত বলে একজন, ইউনিয়নের কর্তাব্যক্তি সুধাংশুর টাকা-পয়সা গুলো তোলার ব্যাপারে সহায়তা করছে এ খবর বাবা আগেই পেয়েছেন। তিনি বলেন, বৌমা তো সামনের হপ্তায় আসবে, তাকে নিয়ে তবে একবার ঘুরে আয়।

মনোরমা এল সঙ্গে ভাইকে নিয়ে। রঙিন শাড়ী হাতে দুগাছা করে সোনার চুড়ি গলায় সরু মপ্‌-চেন। সাদা সিঁথিতে তাকে এখন কুমারী

কুমারী লাগছিল। মুখে বিষণ্নতা ছাড়া অন্যত্র শোকের তেমন কামড় বসেনি। হিমাংশু প্রস্তাবটা জানাল বৌদিকে।

মনোরমার ভাই হিরণ্ময় বলল, খবরটা আমরাও পেয়েছি। আমাদের ওখানের একটি ছেলে ঐ কারখানায় কাজ করে, সেই বলছিল স্বামী মারা গেলে বৌদের কাজ পাবার নাকি আইন চালু হয়ে গেছে।

সুধাংশুর বাবা একবার মাত্র হিরণ্ময়ের দিকে চকিত দৃষ্টি ফেলে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন।

কোয়ার্টারটা এখনো সুধাংশুর নামেই আছে। সেখানেই উঠল মনোরমা হিরণ্ময় আর হিমাংশু। সবিতকে নিয়ে জেনারেল ম্যানেজারের অফিসে দেখাও করে এল একদিন তিন জনে। সবিত বলল,

—টাকা পয়সার ব্যাপারটা হয়ে এসেছে। আর চাকরিটাও হবে, তবে কিছু অপেক্ষা করতে হবে।

হিমাংশু বলে, যাক আপনাকে তো বলা রইল। আমরা তা হলে এখন বাড়ি চলে যাই। মাঝে মাঝে আমি এসে দেখে করে যাব।

—তা যেতে পার। মাস খানেকের মধ্যে টাকাটা পাওয়া যাবে তখন সই করার জন্য তোমার বৌদিকে আসতে হবে।

—কেন আমি সই করলে চলবে না? কি ধরুন বাবা যদি করে?

—না ওঁকেই চাই, উনিই তো, কি বলে, উত্তরাধিকারী তবে উনি যদি তোমাকে অথরাইজ করে দেন তো মনে হয় তুমি সই করলেও চলবে। আচ্ছা, সে আমি জিজ্ঞেস করে রাখব। চলি!

মনোরমা আস্তে আস্তে বলে, আমিই সই করব ঠাকুরপো।

হিমাংশুর সামনে বজ্রপাত হয়। কষ্টে সে সামলে নেয় নিজেকে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলে, তাই হবে।

হিরণ্ময় বাজার গেল। হিমাংশু ব্যালকনিতে বসে রইল চুপচাপ আসন্ন প্রায় সন্ধ্যার দিগন্তের দিকে তাকিয়ে। মনোরমা ভিতরের ঘরে কি একটা ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে রইল। তারপর হিরণ্ময় ফিরলে হিমাংশু 'একটু ঘুরে আসি' বলে বেরিয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্যহীনভাবে এ পথ সে পথ ঘুরে বেড়াল সে। দাদার বন্ধুবান্ধব দু'একজনকে সে চেনে। কিন্তু এই মুহূর্তে কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছিল না তার।

চওড়া চওড়া পরিচ্ছন্ন সুন্দর রাস্তা আলোয় ভাসছে। একই আকৃতির খোপ খোপ কোয়ার্টারের ভেতর থেকে ছিটকে আসছে নীলচে আলো। দরজার পর্দা ঠেলে হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়েআসছে অপ্সরার মত উজ্জ্বল কোনো মহিলা। কোনো কোয়ার্টার থেকে ভেসে আসছে রেকর্ড প্লেয়ার চোঁয়ানোর মধুর সংগীত। হিমাংশু অনেকক্ষণ যেন স্বপ্নের মধ্যে চলাফেরা করে বেড়াল। তারপর হঠাৎ আবিষ্কার করল সে সবিতদার বাসার সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

—আরে এসো এসো হিমাংশু। তারপর কালকেই কি তা হলে চলে যাচ্ছ?

হিমাংশু সহসা উত্তর দিতে পারে না। বলে, দেখি।

সবিত কাগজ পড়ছিল। হিমাংশু অন্যমনস্কভাবে একটা সাময়িকীর পাতা ওল্টায়।

তারপর হিমাংশু হঠাৎ বলে, আচ্ছা সবিতদা চাকরিটা আমার হয় না?

সবিত কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, কেন বলতো?

হিমাংশু সংকোচে এতটুকু। কিন্তু মুখে কথা এসে যায়। বলে,—আসলে আমাদের বাড়িতে এসব ঠিক পছন্দ করে না। তা ছাড়া আমিও বেকার। বুঝছেন তো সবই।

—আচ্ছা। তা হ্যাঁ, তোমারও হতে পারে। যে কোন একজন ক্যাণ্ডিডেটের হবে আর কি। তবে তোমার বৌদিকে সেটা লিখে দিতে হবে।

হিমাংশুর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ ঝাপসা হয়ে যায়।

—আচ্ছা, তা হলে উঠি।

বাসায় ফিরে দেখে হিরণ্ময় ঘুমিয়ে পড়েছে। বৌদি রেডিও শুনছিল। হিমাংশুকে দরজা খুলে দিয়ে যেন দেওয়ালটাকে শুনিয়ে বলল, এত রাত হোল খাওয়া দাওয়া করতে হবে না?

বিছানায় গিয়েও বহুক্ষণ সে এপাশ ওপাশ করে। দাদা থাকতে যে ক'বার সে এখানে এসেছিল। সেইসব দিনগুলোর আনন্দময় স্মৃতি মনে পড়ে তার। সুধাংশু ছিল বরাবরের একটু গম্ভীর ধরণের মানুষ। কথা-টথা বলত কম। কিন্তু সে ফাঁকটা পূরণ করে দিত বৌদি। হাসি ঠাট্টা গাল-গল্পে তাকে ভরিয়ে রাখত। কখনো কখনো মনোরমার সে ঠাট্টা যেন বৌদিত্বের সীমাও ছাড়িয়ে যেত। চোখ মুখ লাল হয়ে উঠত হিমাংশুর। কিন্তু কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল!

হিরণ্ময় তার পাশে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। ও ঘরের বন্ধ দরজার ওপার থেকে

পাখা ঘোরার বনবন শব্দ আসছে। হিমাংশু উঠে ফট করে বারান্দার আলোটা জ্বালায়। কল থেকে জল নিয়ে চোখে মুখে মাথায় নেয়। তারপর বারান্দা অন্ধকার করে মনোরমার ঘরের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। কান পেতে কিছু শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু ঘুরন্ত পাখার শব্দ ছাড়া কিছুই কানে আসে না। হিমাংশু পায়ে পায়ে এসে আবার হিরণ্ময়ের পাশে শুয়ে পড়ে এবং কিছুক্ষণ পরে ঘুমিয়ে যায়।

সকালে উঠে হিমাংশু তাড়া লাগায় হিরণ্ময়কে, জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে নাও, সকাল সকাল রওনা দিতে হবে। কিন্তু বেলা বয়ে যায় মনোরমার দিক থেকে কোন তাড়া দেখা যায় না। হিমাংশু বলে, কি হোল জিনিসপত্র গুছিয়ে নিতে হবে না?

—তুমি বরং ফিরে যাও আমি হিরণকে নিয়ে কিছুদিন এখানেই থাকব।

মাথার উপর ছাদটা এই মুহূর্তে ফেটে চৌচির হয়ে গেলে হিমাংশু এত বিস্মিত হোত না। শুধু অস্ফুটস্বরে সে বলতে পারে, এ তুমি কি বলছ বৌদি!

তারপর হিমাংশু ফিরে যায়। ক দিন পর হিমাংশুর বাবা বেয়াইকে সঙ্গে নিয়ে আসেন বৌমার কাছে। তিনি মনোরমার প্রায় হাতে ধরে বলেন, 'মা লক্ষ্মী, এই তোমার বুড়ো ছেলের কথাটা রাখো মা। এ মতলব ছাড়ো। আমার সুধাংশু নেই। তার প্রতিনিধি হয়ে তুমি আমার ঘরে থাকো। আমার বৌমা হয়ে, মেয়ে হয়ে যতদিন বাঁচবো তুমি থাকবে মা। অভাব আছে আমার সত্য, তবু আমার ছেলেমেয়েরা যদি খেতে পায় তো তোমাকে দিয়ে তবে তারা খাবে। এ কথার আমি সত্যবন্দী হোলাম।'

মনোরমা ধীরভাবে ভেবেচিন্তে, প্রত্যেকটি কথা যেন ওজন করে বলে, "দেখুন, আমারও তো সামনে সারা জীবন পড়ে। চাকরিটা যদি পাই তবে বাঁচার একটা অবলম্বন হবে। সেটা ছেড়ে দেওয়াটা কি ঠিক হবে?"

—না, না ছেড়ে দেবে কেন! ছেড়ে দেবে কেন! চাকরিটা হিমাংশু করুক। তিন তিনটে বছর পাশ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে বেকার। ও ছেলেটাও তাহলে বাঁচে। টাকা কড়ি যা পাওয়া যাবে সবকিছু তোমার নামে জমা থাকবে, আর তোমার অবলম্বন? মেয়ে মানুষের অবলম্বন তো সংসার মা। এই বুড়ো ছেলেটার ভার নেবে তুমি।

তিনি রুমাল দিয়ে চোখের কোণ দুটো একটু মুছে নেন। তারপর বলে

চলেন, 'কি বলব তোমাকে মা, ছেলেটা এখান থেকে ফিরে হুতাশে আধখানা হয়ে গেছে, শুধু বড বড দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছে আর বলছে, বৌদি আমাকে তাডিয়ে দিলে, বৌদি আমাকে তাড়িয়ে দিলে। এ ভিক্ষাটুকু না দিয়ে তুমি কিন্তু আমাকে ফেরাতে পাববে না মা।'

মনোবমাব বাবা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলেন। কিছু না বললে খাবাপ দেখায়। তিনি ফোঁস কবে উঠলেন, 'আপনি কিন্তু মনোবমাব অধিকাবের উপব জববদস্তি কবছেন বেয়াই মশায়।

—অধিকার! আমি স্বধাংশুব বাবা। তাকে খাইযেছি, পবিযেছি, লেখাপড়া শিখিযেছি। জীবনে একটা পযসা জমানোব সুযোগ পাইনি কিসে ওবা ভাল থাকবে, কিসে ওদেব উন্নতি সে চিন্তায় আমি আমাব সমস্ত জীবনটাই ঢেলে দিলাম। আমাব কোন অধিকাব নেই, অধিকাব শুধু হঠাৎ মনোবমাব দিকে চোখ পডতেই স্বব নেমে যায, বলেন, 'কিন্তু অধিকাবেব কথা তো আমি তুলিনি, আমি শুধু ভিক্ষা চেযেছি।

মনোবমা বান্না কবল। শ্বশুবকে সামনে বসিযে যত্ন কবে খাওয়াল এবং সবসময এমন একটা অধবা ভাব তৈবী কবে বাখল যে এ ব্যাপাবটা বৃদ্ধ আব তুলতেই পাবলেন না। ব্যাগ আব ছাতাটি হাতে গুছিযে বেবোনোব আগে মনোরমা আঁচল জডিয়ে বাবাকে আব শ্বশুবকে প্রণাম কবল। ছলছল চোখে শ্বশুব বললেন, 'তোমাব এ বুড়ো ছেলেটিকে যেন ভুলে যেওনা মা।'

ব্যাপাবটা এখানেই শেষ হযে গেলেই বেশ হোত, কিন্তু হোলনা। ইতিমধ্যে ঘটনাটা পাডাময় ছডিযেছে। পাডাপ্রতিবেশীদেব তিক্ত মন্তব্য আব মেয়েব উষ্ণ জিহ্বার মাঝে দাঁডিয়ে বৃদ্ধ বারবার বলতে লাগলেন, ভগবান তুমি আমাকে নাও—আমাকে নাও। হিমাংশু ধীবভাবে বলল, কিন্তু তোমাকে ওবা বললটা কি ?

উত্তবে বৃদ্ধ শুধু এদিক ওদিক মাথা দোলাতে লাগলেন অর্থহীনভাবে। বোনের প্রখর জবাব কানে আসে হিমাংশুর, 'বলবে আবাব কি ? দাদাটাও ছিল একটা ভেডা। ভাই বোন বাবা মা সকলকে কলা দেখিয়ে সবকিছু উনি বৌএর আঁচলে বেঁধে দিয়ে গেছেন। তাঁর আক্কেল সেলামী গোন এখন। চাকরি কববে। দেদাব টাকা—স্ফূর্তি করবে। দুদিন পব নতুন আর একটা কাউকে জুটিয়ে বিয়ে কবে আচ্ছাটি কবে তোমাদের মুখে কালিটি লেপে ড্যাং

ড্যাং করে ঘুরে বেড়াবে

বৃদ্ধ দু'কানে আঙুল গুঁজে আর্তনাদ করতে থাকেন। হিমাংশু পাগলের মত টলতে টলতে সরে যায় সেখানে থেকে।

*　　　*　　　*

সবিত বলেছিল মাসখানেকের মধ্যে টাকাটা পাওয়া যাবে। প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর আর কি সব যেন মিলিয়ে বেশ কয়েক হাজার টাকা। মনোরমা মনে মনে ভেবে রেখেছিল, এর থেকে কিছুটা টাকা সে সুধাংশুদের বাড়িতে পাঠিয়ে দেবে। সত্যিই তো, সুধাংশু তাকে বিয়ে করেছিল। ভালোও বেসেছিল তার একবছরের স্বামীত্বে সর্বক্ষণ। সেও যথাসাধ্য তাকে ভালবেসেছিল। সুধাংশু তাকে কল্পনায় কত কি সাজাত। সেও মনে মনে তার কল্পনায় নিজেকে মিলিয়ে সুখ পেত। এত শীঘ্র সন্তান সুধাংশুই চায় নি—নইলে মনোরমার আপত্তি ছিল না। যাই হোক, তবু সে মনে করে না সুধাংশুর সব কিছুর ওপর তারই একচ্ছত্র অধিকার। তার যা গেল, তার ক্ষতির কোন শেষ নেই। কিন্তু সে তো শুধু তার স্বামীই ছিল না। যাদের সে সন্তান, দাদা তাদের ক্ষতিরই বা পরিমাপ হবে কিসে!

একবার তার মনে হয়েছিল টাকাটা সে হিমাংশুকেই লিখে দেয়। কেন যেন ভয় হয়েছিল, ওরা যদি তাকে বঞ্চনা করে! সত্যি বলতে কি যে নিকট সংস্পর্শে আত্মীয়তা গড়ে ওঠে শ্বশুর বাড়ির সঙ্গে সে সংস্পর্শ গডার সুযোগ হয়নি তার। সুধাংশু তাকে ছেড়ে থাকতে পারত না, আর মনোরমারও খুব আগ্রহ ছিল না সেই ধ্যাধ্ধ্যাড়া গোবিন্দপুরে পডে থাকতে। সুতরাং বিভিন্ন উপলক্ষ্যে যখনই বাড়ি থেকে চিঠি আসত, 'বৌমাকে নিয়ে দিনকতকের জন্য চলে এস, সুধাংশু জিজ্ঞেস করত, 'কি করবে, যাবে?' একটা না একটা কাবণ খুঁজে পাওয়া যেত না—যাওয়ার পক্ষে! মনোরমা বলত, 'যাওয়ার সময় তো আর পেরিয়ে যাচ্ছে না। লিখে দাও, পরে যাব 'খন।'

মাঝে মাঝে শুধু হিমাংশু আসত। দু একদিন থাকত, সিনেমা দেখত আমোদ ফূর্তি করত। আসলে এই দুটো সংসাবে সেই ছিল একমাত্র যোগসূত্র। হিমাংশু মনোরমার চেয়ে সামান্য বড়। সুতরাং একাধারে বন্ধু এবং শ্বশুর বাড়ির প্রতীক বলতে মনোরমার চোখে হিমাংশুর ছবিই ভেসে উঠত।

ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে আজ আর সেই সম্পর্ক নেই। অন্ততঃ মনোরমার তাই ধারণা।

এ দিকে ঘটনা যা ঘটে চলেছে মনোরমার সব হিসেব গরমিল করে দেয়। একমাস পার হয়ে গেছে। কিন্তু টাকাটার ব্যাপারে কতদূর কি হয়েছে সে জানে না। চাকরির ব্যাপারেও তথৈবচ। সবিত বাবুর বাড়ি গিয়ে দু'দিন তাকে পায়নি। তৃতীয় দিনে সবিতের স্ত্রী তাকে স্পষ্ট ভাষাতেই বুঝিয়ে দিল, 'এমনিতেই ওকে নানান ঝামেলা নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। আপনারা যদি শেষ অব্দি বাড়ি ধাওয়া করেন তাহলে ঘর দোর ছেড়ে সন্নিসি হয়ে যেতে হবে ওকে। তা ছাড়া, আপনি নিজেই বা বার বার আসেন কেন? আপনার সেই দেওর না কে যেন আসত, ওকেই পাঠাবেন।

এদিকে তার হাতে টাকাকড়ির সম্বল যা ছিল তা প্রায় শেষ। সব অবস্থা জানিয়ে বাবাকে চিঠি দিয়েছিল একটা। উত্তর এসেছে কাল। তার বক্তব্য সংক্ষেপে এই, 'তোমাদের ব্যাপারটা তোমরাই বুঝে নাও। আমি বৃদ্ধ, অসমর্থ। আমাকে এর মধ্যে জড়িও না।' আসলে, মনোরমা বুঝল উনি ভয় পেয়েছেন। সোমত্থ বিধবা মেয়ে ঘাড়ে বোঝা হয়ে না বসে। ব্যাপারটার এত জটিলতা এত খুঁটিনাটি ওকে অবশ্য বোঝাবার সময়ই বা মনোরমা কই পেল। আর চিঠিতে কতটুকুই বা লেখা যায়!

এদিকে আর এক ধরনের উটকো বিপদ লাল সংকেত দেখাচ্ছে। কিছুদিন হোল কিছু বেহায়া ছেলে-ছোকরা মনোরমার কোয়ার্টারের ঠিক তলায় ঝাঁকড়া গাছটার নিচে যখন তখন আড্ডা মারে। কোন কারণে মনোরমা ব্যালকনিতে বার হলে, ওদের তৃষিত দৃষ্টি তাকে বিদ্ধ করে—কিছু কিছু মন্তব্য কানে আসে হিরণের সঙ্গে ভাব জমাতে চেষ্টা করে। ওর বয়স কম, তবু কিছু যেন গন্ধ পায়। সেও এড়িয়ে যায় ওদের। কিন্তু কতদিন ঠেকাতে পারবে কে জানে!

মনোরমার এক বাল্য বিধবা মাসী ছিল। দু'মুঠো ভাতের জন্য তার অনবরত সংগ্রাম সে দেখেছে। যুগ অন্য হলে, হয়তো তাকেও ওই পথই বেছে নিতে হোত। কিন্তু একি, ঐ তার হাতের অল্প দূরে মাটি দেখা যায়—আর সে ঐটুকু দূরত্বে দাঁড়িয়ে ডুবে মরে যাবে। মনোরমা প্রায় মরিয়া হয়ে শেষ পর্যন্ত হিমাংশুকে একটা চিঠি লিখে ফেলে।

প্রিয় ঠাকুপো,

অনেক ব্যথা নিয়ে তুমি সেদিন এখান থেকে চলে গেছ। সে তুমি না বললেও তোমার মুখ দেখে আমি বুঝেছি। তুমি যে আমার অনেক দিনের চেনা। কিন্তু বিশ্বাস কর তোমাকে ব্যথা দিতে আমি চাইনি।...

এই অবধি লিখেই থমকে যায় সে। চিঠিটা বড্ড খোশামুদে মনে হচ্ছে। হিমাংশু পড়ে ভাববে, এখন মনোরমা ঠ্যাকায় পড়েছে তাই চিঠিটা ছিঁড়ে ফেলে দেয় সে। তারপর হাতমুখ ধুয়ে এসে আবার একখানা চিঠি লিখতে বসে।

'ভাই হিমাংশু,

খুব দরকারে পড়ে তোমাকে চিঠি লিখছি। যদি পার, পত্রপাঠ চলে এস। সাক্ষাতে সমস্ত জানাব। তোমার যদি মনে কোন রাগ থাকে তবুও এস। রাগ দেখাবার সময় পরে অনেক পাবে। ইনিয়ে বিনিয়ে পাঁচ কথা লিখে তোমাকে বিরক্ত করতে চাই না—তাই যা বলার সোজাসুজি লিখলাম।

ইতি

মনোরমা।'

পুনঃ—বাবাকে আমার প্রণাম জানাবে। তোমরা আমার ভালবাসা নিও।

এ চিঠিটাও ছিঁড়ে ফেলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু মনোরমা নিজেকে সংযত করে। পাছে পরে মন পাল্টে যায় তাই ঝুঁকি না নিয়ে সে তৎক্ষণাৎ রওনা দেয় এবং রাস্তার মোড়ে চিঠিটা ফেলে দিয়ে তারপর স্বস্তি পায়।

পরদিন সকালে ভিজে চুলে ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে শাড়ি মেলছে সে, হঠাৎ দেখে, দু হাতে বিশাল দুটো ঝোলা হাতে হিমাংশু সিঁড়ি মুখে ঢুকছে। হিমাংশুর পায়ের শব্দ সিঁড়িতে তখনো বাজছে, মনোরমা দরজা খুলে তার প্রতীক্ষা করে। তারপর হিমাংশু মুখোমুখি হলে বলে, বাঃ কাল দুপুরে চিঠি ফেললাম, এত তাড়াতাড়ি পেয়ে গেলে কি করে?

দরজায় পাল্লায় লেপটে থাকা মনোরমার বুকের খুব কাছ দিয়ে হিমাংশু পেরিয়ে গিয়ে ঝোলা দুটো নামায়—তারপর বলে, তোমার তো কোন চিঠি পাইনি—দিয়েছিলে নাকি?

প্রথম চিঠির ছেঁড়া টুকরোগুলো তখনও পড়েছিল। সেগুলো একত্র করে মনোরমা হিমাংশুর হাতে তুলে দেয়। বলে, এটা পাঠাতে ভালো লাগলো না। অন্য একটা চিঠি দিয়েছি?

—কি লিখেছ?

—সে এখন আর অতশত মনে নেই।

আসবাবপত্রের সেই পুরাতন ছিমছাম অন্তর্হিত। মনোরমার চোখ মুখ বসা। চুল ও শরীর শ্রীহীন, অযত্নস্পৃষ্ট। বাথরুমের কলটা থেকে সরু ধারায়

অবিবত জল পড়ছে কিছুটা বাথরুমের সীমানা পেরিয়ে চলে এসেছে মাঝের বারান্দায়।

হিমাংশু প্রশ্নাতুব চোখ তুলে মনোবমাব দিকে তাকিয়ে থাকে।

মনোরমা চুলে চিরুণি দিতে আয়নার সামনে যায়। আয়নাতে হিমাংশুব ছায়া মনোরমা ছায়ার সঙ্গে কথা বলে—

'বাবা খুব রাগ করেছেন না?'

'কবাটা খুব অস্বাভাবিক নয়।'

মনোরমা ঘুরে হিমাংশুর মুখোমুখি দাঁড়ায়। তাবপর ফেটে পড়ে:

'বা, বা, বাবা রাগ করবে, তুমি রাগ করবে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সকলে আমার উপব রাগ কববে, রাগ করার অধিকাব নেই শুধু আমার, না! কেন? কেন? আমি পবেব মেয়ে বলে ' দু' হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে মনোরমা।

আব হিমাংশু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে। এমন কি মনোবমার সঙ্গে এক রাশ ঝগড়া করার সংকল্পও তলিয়ে যায়। সে ধীরে ধীবে উঠে জামাকাপড় ছাড়ে। চোখে মুখে জল নেয়। তাবপব বলে, চা করবে না?

—এই করি, দুধ নেই কিন্তু।

—ঠিক আছে।

ঘর দোরের এ হাল তো কোনদিন দেখিনি। তোমারও শরীরের এই অবস্থা!

মনোবমা চুপ করে থাকে। হিমাংশু অনুভব করে, অনেক না বলা কথা যেন থমকে আছে এই ছোট্ট শরীরটা ঘিরে। সে আর কিছু জিজ্ঞেস করে না। একদা পরিচিত এই দু' কামরা বাসার মত এই নাবীও তার কাছে ক্রমশঃ অচেনা হয়ে উঠছিল। তার এই এখানে আসা, এটা বাড়িতে প্রায় সকলের অপছন্দ। তবু সে এসেছে। তার নিজের কাছেই এর কোন ব্যাখ্যা ছিল না একটু আগে অবধি। কিন্তু এই মুহূর্তে, এই নিস্তব্ধতাই তার কাছে মুখর হয়ে উঠল। দিনের আলোয় স্পষ্ট করে দিল সব কিছু।

চা খেয়ে হিমাংশু আবার জামাকাপড় পরল। বাজারের থলিটার আষ্টেপৃষ্ঠে মাকড়সার জাল। থলিটা হাতে নিয়ে হিমাংশু বেরোবে। হঠাৎ হিরন্ময়ের কথা মনে পড়ে।

—হিরণ কোথায়? ওকে দেখছিনে?

—দু'দিন হোল বাড়ি চলে গেছে।

—সে কি!

—হ্যাঁ, আমিই চলে যেতে বললাম। শুধু শুধু একজন লোকের অন্ন যোগাড় সে রকম বিলাসিতা করার ক্ষমতা নেই আমার।

হিমাংশুর চোখ বিস্ময়ে ছোট হয়ে যায়, তুমি একেবারে পাকা ব্যবসায়ীর মত কথা বলছ।

মনোরমা ছোট করে হাসে, নাঃ, ঝগড়াটা এখন তোলা থাক, তাড়াতাড়ি বাজার করে না আনলে রান্নার অনেক দেরী হয়ে যাবে।

সিঁড়িতে হিমাংশুর পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। মনোরমা দরজা বন্ধ করে এসে আলমারির সামনে দাঁড়ায়। প্রমাণ সাইজের আয়নায় তাঁর ছায়া স্থির হয়ে থাকে। আলমারির মাথায় সুধাংশুর পাশে তার বিয়ের কয়েকদিন পরের তোলা ছবি! মনোরমা একদৃষ্টে সুধাংশুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর সে একটু কাঁদে। চুল আলুথালু হয়ে যায়, চোখের তলা অল্প অল্প ফুলে ওঠে, কিন্তু কই তাকে তো কুৎসিত লাগে না। তারপর কি খেয়াল হয় আস্তে আস্তে সারা শরীর সে মেলে ধরে সুধাংশুর সামনে। সুধাংশুর নির্বাক ছবি আর আয়না, আর সে নিজে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে তার সুগঠিত বিবস্ত্র দেহের দিকে। কোথাও কোন অপূর্ণতা নেই—কার্পণ্য নেই। সমস্ত পূর্ণতা নিয়ে শূন্যতার আগুনে প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গ জ্বলছে। মনোরমা সুধাংশুর ছবির কাঁধ ধরে ঝাঁকি দেয়, বল, বল। তুমি বল নিষ্ঠুর·

কিছুক্ষণ পর সে আবার চিরুনি হাতে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়ায়। অন্যদিনের মত কয়েকটি ঝাঁকড়া চুল যথারীতি গুলতানি করছে গাছটার, তলায়। কিন্তু মনোরমা তাদের গ্রাহ্য করে না। ওদের মাথা টপকে তার দৃষ্টি চলে যায় আরো দূরে, বহুদূরে। সেখানে পার্কের সবুজ ঝাউ আর কৃষ্ণচূড়ার মধ্যে আকাশে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে ইউক্যালিপটাস। আরো ডান দিকে সকলের মাথা ছাড়িয়ে তাকিয়ে আছে লোহার ফ্রেমে গড়া ট্রানস্‌মিসান টাওয়ার টা। কত লোকের কত বার্তা ধরছে, ছাড়ছে—ধরছে ছাড়ছে···

দরজা খুলে দিতেই হিমাংশু ঘরে ঢুকে উত্তেজিতভাবে বলে, শোন, সবিত-দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বলল, যেকোনভাবে আজ বারোটার মধ্যে জি এম-এর অফিসে আসতে। উনি কালকেই বাইরে চলে যাচ্ছেন বেশ কিছুদিনের জন্য। এদিকে নটা তো বাজে! উনি খুব দুঃখ করছিলেন, তুমি নাকি ওঁর সঙ্গে·

কোনো যোগাযোগ রাখনি। না হলে কতদিন আগেই সবকিছু ফয়সালা হয়ে যেত।

মনোরমা ম্লান হাসে। বলে, হিমাংশু তুমি বয়সে আমার ক'বছরের বড় তাই না ? কিন্তু একদিনে আমার রোজ এক বছর করে বাড়ছে।

হিমাংশুও হাসে। হো হো করে বুক ফাটা হাসি। বলে, বেশ, এরকম কিছু দিন চললে তুমি তো আমাব ঠাকুরমা হয়ে যাবে!

তারপরে রান্নাঘরে বসে তরকারি কুটতে কুটতে মনোরমা এক এক করে বলে চলে তাব বিগত কয়েক দিনেব অভিজ্ঞতা। সবিত বাবুর বাড়ি অভিযান, তাঁর স্ত্রীর আপ্যায়ন, অফিস, দিনেব পব দিন বাডি বাড়ি ধর্ণা। শুধু, পয়সা বাঁচাবার জন্য সে যে একদিন আলু ভাতে ভাত খেযে কাটিয়েছে এবং হিবন্ময় যে এই কাবণে ঝগডা কবে চলে গেছে এই তথ্যটা সে গোপন বাখে।

সব কাজ সেরে ফিবতে ফিবতে প্রায় দুপুব গডিয়ে যায়। ঝাঁ ঝাঁ রোদ। অল্পতেই ক্লান্ত কবে। তবু ভাল টাকা কডিগুলোব একটা ব্যবস্থা হোল। হয়তো আব কয়েকদিনের মধ্যে পাওয়া যাবে। কিন্তু চাকরির ব্যাপারটাব আবো কিছু দেবী হবে। অনেকরকম আইনগত ফ্যাকডা আছে। তাছাডা আবো একটা কথা জানা গেছে সবিতেব মাবফৎ। কোম্পানী চাকরি দেবে—কিন্তু কোন কোয়ার্টাব দিতে পাববে না। অর্থাৎ মনোবমাকে এই কোয়ার্টার এবং এক বছবেব এই পবিচিত পবিবেশ ছেডে পথে দাঁডাতে হবে।

ফুলস্পীড পাখাব তলায় বসে হিমাংশু। মনোবমা চা চডিয়ে দিয়ে এসে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়—'এরপর ?'

—এরপর আমার ছুটি! রাত্রে একটা ট্রেন আছে। সন্ধ্যায় বেবোলেও ধবা যাবে।

—বেশ।

মনোরমা চা খেয়ে ঢুকল বাথরুমে। তারপর বেশ সময় নিয়ে চান করল। অনেকদিন পর পরিপাটি সাজল অনেকক্ষণ ধরে। হিমাংশু একটা পুরাতন পত্রিকা মুখের উপর ধরে ব্যালকনিতে বসে বসে আকাশ-পাতাল চিন্তা করতে লাগল।

খুব ধীরে গুড়ো গুঁড়ো সন্ধ্যা ঝরে পড়ছে গাছ-গাছালির মাথায়। রাস্তায় নিয়ন আলো প্রয়োজনের আগেই জ্বলে উঠেছে। রং-বেরঙের পোষাকের বাহারে রাস্তা ঝলমল। একটু দূরে পার্কে বাচ্চারা সন্ধ্যার পাখির মতই কলকল করছে আনন্দে। হিমাংশু বই ফেলে লোভী দৃষ্টিতে সবকিছু দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যায়।

ঘরের ভেতর উজ্জ্বল বিদ্যুতের তলায় বিদ্যুৎ হয়ে জ্বলছে মনোরমা। বার বার সে যাচ্ছে আসছে। একটু দাঁড়াচ্ছে, কিছু একটা নাড়ছে। আবার যাচ্ছে। হিমাংশুর অজান্তে একটা দীর্ঘশ্বাস বুক চিরে বেরিয়ে আসে।

—সময় হয়ে এল আমার।

—বেশ!

হিমাংশুর গলায় ক্রোধ হিসিয়ে ওঠে। কি তখন থেকে খালি বেশ বেশ করছ।

মনোরমা খিলখিল করে হেসে ওঠে। কেন, তুমি কি ভেবেছিলে আমি তোমার পায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ব যেও না যেও না বলে।

বিস্মিত হিমাংশু টান টান উঠে দাঁড়ায়। শরীরের সব রক্ত তার যেন মুখে এসে জমা হয়েছে। বেশি উত্তেজিত হলে তার স্নায়ু অবশ হয়ে যায়। হিমাংশু দরজার খোঁজে একবার এগিয়ে যায়। তারপর খেয়াল হয় জামাপ্যাণ্ট পরা হয় নি। আবার পিছিয়ে আসে।

মনোরমা এগিয়ে আসে, 'দাঁড়াও।' হিমাংশু হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। সে বিকৃত গলায় বলে, 'আমার এত উপকার করে দিলে তার মজুরীটা নেবে না? বিনা মজুরীতে আমি কাউকে কাজ করাই না।'

আলমারীর মাথার থেকে সুধাংশু-মনোরমার ছবিটা এনে মনোরমা হিমাংশুর হাতে গুঁজে দেয়। তারপর দৌড়ে ঘরে ঢুকে দড়াম করে দরজা বন্ধ করে দেয়। তার ফোঁপান কান্নার শব্দ দরজা ছাপিয়ে উপচে পড়ে।

হিমাংশু আর্তনাদ করে ওঠে, এর মানেটা কি, য়্যা এর মানেটা কি!

* * *

হিমাংশু শেষ পর্যন্ত চাকরিটা পেয়েছে। বাজারে একটি ছোট্ট ঘর ভাড়া নিয়ে মনোরমার সঙ্গেই সে থাকে। হিমাংশুর বোনটিরও বিয়ে হয়ে গেছে।

হাতে ফেলিও ব্যাগ ঝুলিয়ে হিমাংশু যখন চাকরি করতে যায় মনোরমা বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকে। হিমাংশু পিছন ফিরলেই ঠিক সুধাংশুর মত লাগে। কখনো কখনো খোকা জেগে গেলে, মনোরমা তাকে কোলে তুলে নিয়ে, শেখায়, বাবা বাবা···তারপর নবম ফুলো ফুলো গালে চুমো খায়।

শুধু কোন কোন অন্তহীন দুপুর মনোরমাকে যখন আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে, সে পুরাতন তোরঙ্গের পুরাতন কাপড়ের ভাঁজ থেকে সুধাংশু মনোরমার সেই পুরাতন ছবিটা বার করে ঘুরিয়ে দেখতে থাকে। চার পাশের ঘিঞ্জি বসতি ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি কিছু যেন খুঁজতে থাকে, হয়তো অকারণে তার চোখ ঝাপসা হয়ে যায়। []

ইস্পাতের ফসিল

ঘড়ির কাঁটা ক্রমাগত সময় কাটতে লাগল।

আমরা অর্থাৎ একরাশ শাল, পাঞ্জাবী, সার্জ, টেরিউল, গেবাডিন, টেরিভয়েল, ফারকোট সেই কর্তিত সময়ের স্তূপের সামনে একে অপরের দিকে তাকিয়ে বসে ছিলাম অসহায়ের মত। নীল আলোর তলায় এই ভৌতিক নৈঃশব্দ, আমাদের আঙ্গুলে দামী সিগারেটের ধোঁয়া আর বাইরের খচ্চর অন্ধকার আমাদের হৃদয়ের প্রতিশ্রুত বাঙ্ময়তাকে সর্বক্ষণ বাধাপ্রাপ্ত করছিল।

আমরা, অর্থাৎ কমবেশী ৫ফুট ৭ইঞ্চি লম্বা ১২টি ৩২ বছরের প্রৌঢ় ও সমানুপাতিক ১২টি যুবতী প্রতি বছরের মত এবারও মিলিত হয়েছিলাম একটি বিশেষ দিনকে মনে করে কিছু পানভোজন করার উদ্দেশ্য নিয়ে। দশ বছর আগেকার সেই দিনটিতে বর্তমান যুবতীরা অবশ্য কেউই আমাদের পাশে ছিল না, কিন্তু একে একে তারা বারোজন আমাদের বারোজনকে দখল করেছে। ইস্পাতকারখানার চারপাশে মনের মেটাবলিসমের উপযুক্ত খাদ্যপ্রাণ সীমাবদ্ধ, তথাপি রমণী জাতির এ ব্যাপারে কিঞ্চিৎ পটুত্ব আছে ইহাই ধারণা ছিল।

রঙিন কাপে ধূমায়িত চা বিতরণ করা হলে আমরা তার মসৃণ উপরিতলে আমাদের দশবছর আগেকার প্রতিবিম্ব দেখার চেষ্টা করলাম। পাহাড় ঘেরা পরিবেশে সেও ছিল এমনি এক চিমনি, ধোঁয়া, ক্রেণ আর ইস্পাত পিণ্ডের জগৎ। গায়ে আমাদের অনেকের তখনো শিক্ষায়তনের গন্ধ, গালে অনেকের তখনো টোল পড়ে। আমরা কেউ বিক্রমপুরের, কেউ শ্যাওড়াফুলির কেউবা বাঁকুড়ার। আমরা পরস্পরকে চিনলাম ১৬০০ ডিগ্রী উত্তাপের তলায়। তারপর তাপ আর চাপ পেতে পেতে উদ্ভিদ যেমন কয়লা হয়ে যায়, তেমনি আমরা, জানিনা, কখন কেমন করে শ্রমিক হয়ে গেলাম। আমাদের এই বারোজনের প্রত্যেকের ডায়েরীতে সেই ১৯৬৪ সালের ১লা অক্টোবর তারিখটি গভীর লাল রেখার চৌকোতে আবদ্ধ আছে। রুরকেল্লার ইস্পাত কারখানার ফ্লোরে দশ বছর আগেকার বারোটি শিক্ষানবিশের সেই পরিচয় গড়াতে গড়াতে আজ এই বারোফুট বাই বারোফুট ফার্নিশ্‌ড ড্রইংরুমের নীল আলোর তলা পর্যন্ত টেনে এনেছি আমরা।

আজ আমরা এক একজন ইস্পাতশিল্পের গলন, বেলন, উত্তাপন, বিপনন ইত্যাদি কোন না কোন ব্যাপারে ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং দশ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন। আজ আমরা বলতেই বোঝায় এই টেরিউল, সার্জ, গেবার্ডিন, ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি ইস্পাতশিল্পে ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং অভিজ্ঞ ৮০০ টাকা মাইনে, উঁচুতলার শ্রমিক, নাক সেঁটকানি, চশমা, সন্তান সন্ততি, নেয়াপাতি ভুড়ি, প্রমোশন, ইউনিয়ন, বোনাস ইত্যাদি প্রভৃতির নানান অনুতাপে লাল নীল মিশ্রণ। একই জিনিস, তবু কিছুতেই যেন মিশ খায় না।

জানালার ফ্রেমে মোটা মোটা লোহার গরাদ। তার ভেতর দিয়ে দৃষ্টি ছুঁড়ে দিলে বহুদূরে দেখা যায় দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানার সবুজাভ নীল নীয়ন সাইন—পাশে উজ্জল আলোর টোপর পরা চিমনি, সার সার। কোনটা ধোঁয়া ওগরাচ্ছে, কোনটা শান্ত সুবোধ বালকের মত দাঁড়িয়ে আছে চুপটি করে। আইসক্রীমের স্তূপের মত অনুজ্জ্বল মাঠে জমে আছে কোয়ার্টারের পরিত্যক্ত ধোঁয়া।

আমবা সকলেই সময় কাটাবাব নাম করে খানিকক্ষণ বাইরের দিকে দৃষ্টিটাকে চালান করে দিচ্ছিলাম। মুখ দেখে বুঝছিলাম প্রত্যেকেই আজ আমরা ভারা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেছি। আমাদের সামনে টেবিল, নক্সা কাটা সুন্দব টেবিল-ঢাকা-ফুলদানিতে সুগন্ধি ফুল তার সঙ্গে মিশেছে ধূপ আর আমাদেব পাশে পাশে সুন্দরীদের প্রসাধনের সুগন্ধ। আমাদের আঙুলে দামী আংটি, দামী সিগারেট, সামনে সুখাদ্য, ফুরোতে না ফুরোতে উপচে ওঠা টি-পট। তবু কিছুতেই আমরা এই কঠিনকালো অস্বস্তিটাকে আমাদের গা থেকে ঝেড়ে ফেলতে পাবছি না।

যে কেউ শুনলে অবাক হবে, তখনও পর্যন্ত আমবা কেউ কোন কথা বলিনি। না, বোবা আমরা কেউ নই। বোবা হলে আব যাই হোক এই ইস্পাত-কারখানায় কাজ কবা যায় না। সোকিং পিটের কান ফাটানো আওয়াজকে চিড খাইয়ে দূরের কোন আগন্তুককে ডাকার জন্য তীব্রস্বরে ঠোঁটে হুইসল বাজানো যায় না। একই সঙ্গে দুকানে দুটো টেলিফোন লাগিয়ে অনর্গল ধারায় রিপোর্ট দেওয়া যায় না। আরো অনেক কিছুই করা যায় না। কিন্তু কারণ সেটা নয়।

আসলে, ধীরে ধীরে কথা বলতেই আমরা ভুলে যাচ্ছি। কথার চারপাশে কাজের চর্বি জমতে জমতে আজকাল আমার তো এমন হয়েছে, কথা বলতে গেলেই বেরিয়ে পড়ে কাজের কথা! কথার কথা, অর্থাৎ যা দিয়ে বন্ধু কথা বলে

বন্ধুর সঙ্গে, আত্মীয় কথা বলে আত্মীয়ের সঙ্গে, সেসবের পাট আমরা আজকাল প্রায় ভুলে দিয়েছি অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানের মত। ফলে যখন আমরা কারখানায় থাকি, কানে অহরহ নানান ধরনের, সরু মোটা গর্জন মিলিয়ে একটা অদ্ভুত কর্কশ আওয়াজ কানের পর্দায় ঘা দেয় তখন আমরা বেশ থাকি, স্বচ্ছন্দে বলি, 'হ্যালো সিন্‌হা, হাইড্রলিক প্রেসারটা কত ভাই?' বা 'অমুক হিটটার কেমিক্যাল অ্যানালিসিসটা পাঠাও তো চটপট। আমাদের বাধো বাধো ঠেকে না। জলের মধ্যে মাছের মত আমাদের তখনকার সেই স্বচ্ছন্দ গতি যদি কেউ দেখে সে বুঝতে পারবে না বাজারের থলি হাতে বা সিনেমা হলে সত্যিই যদি সশরীরে আমি সিনহাকে বা সিনহা আমাকে দেখে ফেলে তবে কেন আমাদের বুক ধুকপুক করে, আমরা একে অপরকে এড়িয়ে যাবার রাস্তা খুঁজি। বড়জোর শুধু চোখটা একটু তুলে ঘাড়টা একটু কাত করে সংকেত 'ভালোতো' এইটুকু জানিয়ে পাশ কাটিয়ে চলে যাই। কারখানার লোক যারা তারাই শুধু এর মর্ম বোঝে। গুডমর্নিং এর পরিবর্তে কোন শিফট? জিজ্ঞেস করে সম্বোধন বা বি-শিফটগামী বাসে বসে থাকা লোককে কি, আপনার বি শিফট?' এই ধরণের প্রশ্নে শুধুমাত্র তারাই পারে হাসি চেপে রাখতে।

আমাদের বারো বারো চব্বিশ জনা, জোড়ায় জোড়ায় এসেছে। পূর্ববর্তীদের সঙ্গে চোখাচোখি করে ঘাড় হেলিয়ে প্রচলিত কায়দায় পরস্পরকে নিঃশব্দে সম্বোধন করে টেবিলের চারপাশে পাতা চেয়ারে বসেছে। চাকর এগিয়ে দিয়েছে চা-ভর্তি টি-পট স্ন্যাক্‌স, সিগারেট। ব্যস তারপর সেই চা ঢালা, ধীরে ধীরে সিপ করা, সিগারেট ধরানো জানালার গরাদের ভেতর দিয়ে দৃষ্টি ছুঁড়ে দেওয়া, নাক মুখ দিয়ে কুলকুল করে ধোঁয়া ছাড়া, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে দেওয়ালে যেখানে '১৯৬৪'-র ১লা অক্টোবরের শিক্ষানবিশদের 'পুনর্মিলন সভা' লেখা ফেস্টুনটার গায়ে ১০ বছরের প্রাচীনতা, সেখানের দিকে কয়েক মিনিট চেয়ে থাকা। একেবারে এক, হুবহু এক। যেন একই রীল ঘুরিয়ে পর্দায় বার বার একই ছবি ফেলা।

শুধু অনিমেষ ফেস্টুনটার উপর থেকে নজর সরিয়ে আনতে আনতে পাশে বসা এক ফার কোটের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছিল অনুচ্চ কণ্ঠে —'দেখতে দেখতে দশ-দশটা বছর কেটে গেল, হ্যাঁ।' আমাদের রুরকেল্লার শিক্ষানবিশ জীবনে অনিমেষ বাঁশি বাজিয়ে আমাদের প্রভূত আনন্দ দিত। বর্তমানের থলথলে মাংসল অনিমেষের সঙ্গে সেই অনিমেষের কোন মিল নেই, তবু তার কথাটা আমার ভালো লাগল।

অনিমেষের কথাটা লুফে নিয়ে অন্য কেউ ধরে কিনা দেখার জন্য উদগ্রীব হয়ে রইলাম। একজন সিগারেট ধরাল। নড়ে চড়ে বসল ক'জন। শাড়ীতে খসখস শব্দ হোল কারুর বা। তারপর আবার একসময় ঝড় কেটে যাওয়া বৈশাখী আকাশের মত সব কিছু স্থির হয়ে এল। কি আশ্চর্য! এই এক ডজন মানুষের মধ্যে অন্তত চারজন পুরো একটা দানবীয় যন্ত্র খুলে ফেলে অবলীলায় আবার জোড়া লাগিয়ে দিতে পারে। একটা তিমি মাছের মত ইস্পাতপিণ্ডকে চোখ বন্ধ করে নিমেষের মধ্যে একতাল আটার মত বেলে দিতে পারে নিখুঁত সাইজে, বাঁটিতে আলু কাটার মত পিস পিস করে কেটে ফেলতে পারে। একশো ফুট দূর থেকে গলিত ধাতুর রং দেখে বলে দিতে পারে ওর মধ্যে মালমসলার মিশেল ঠিক পরিমাণে আছে কিনা। পারেনা শুধু একটার পর একটা কথা সাজাতে। কথার পর কথা ইটের মত সাজাতে সাজাতে দশ বছরের পুরনো বন্ধুত্বের আনন্দ দিয়ে একটি উৎসবের ইমারত গড়তে। ব্লাস্টফার্নেসের চ্যানেল দিয়ে গড়িয়ে পড়া রক্তের মত লাল তরল ধাতু এমনই অকাতরে নিঃশেষ করে শুষে নিয়েছে আমাদের মনের রং।

অথচ এরকম তো ছিলাম না আমরা কেউ। দশ বছর আগেকার কথা মনে পড়ছে আমার:

অনিমেষের বাঁশি বেজে উঠতেই আমরা ওর চার পাশে গোল হয়ে বসে গেলাম। সামনে সবুজ ঘাসে ছাওয়া মাঠে তখনো পোঁতা আছে একটু আগে আমাদের খেলার চিহ্ন তিনটি খাড়া উইকেটে। একটু দূরে হোস্টেলের টানা লম্বা বারান্দা। অনেক দূরে শীসে রং এর পূর্ব পশ্চিমে বিস্তৃত রুরকেল্লার পাহাড়ে নেমে আসছে ৩১শে ডিসেম্বরের হিমেল সন্ধ্যার আবছা অন্ধকার।

অনিমেষ বাঁশিতে 'নতুন যুগের ভোরে…' গানটা বাজাচ্ছিল। ফাঁকা মাঠের ওপর দিয়ে সে সুরের প্রাণমাতানো ঢেউ ছড়িয়ে পড়ছিল একটু একটু করে বাতাসে। আমাদের পরণে সাদা প্যান্টশার্ট কেডস। পায়ের তলায় সন্ধ্যার সামান্য শিশির ভেজা ঘাস, মাথার উপর শীতের আকাশ। গভীর রাতে এই পুরোন বছরটা বিদায় নিয়ে চলে যাবে চিরকালের জন্য। ওধারে অনেক দূরে খ্রীশ্চান এ্যাসোসিয়েশনে ওরা নতুন বছরকে অভ্যর্থনা জানাবে তুবড়ী আর হাউই-এর আলোতে। আমাদের ওসব নেই। আমাদের শুধু গান আর হৃদয়ের গভীর থেকে উৎসারিত আনন্দের প্রবাহ।

সিগারেটের ধোঁয়া একটা কুহেলিকার মত বলয় তৈরী করে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে পাটখোলা জানালার ভিতর দিয়ে। সেই অনিমেষ। আমাদের

সামনে বসে এখন আর এক অনিমেষ। থলথলে চেহারা, মেদাক্রান্ত ভারী গালের ভিতর দিয়ে দশ বছর আগেকার সেই তীক্ষ্ণ চেহারা সৌম্যকান্তি যুবকটিকে কোথাও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

আমার মনের মধ্যে কোথাও যেন শূন্যতার একটা বেদনা পাক খেয়ে উঠছিল। আমাদের এই বারো জোড়া নরনারীর বুকের ভেতর থেকে বারো জোড়া ফসিলের ফসফরাস মুখ যেন উঁকি মারছিল। মরিয়া হয়ে একবার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চাইলাম আমি।

টেবিলের প্রান্তসীমায় উপবিষ্ট এক কনকচাঁপা টেরিভয়েলকে লক্ষ্য করে বললাম, 'আপনি কিছু বলবেন মনে হচ্ছে, বলুন না।'

কেউ কেউ একটু আড়মোড়া ভাঙল। মহিলারা হাই তুলল কেউ কেউ। টেরিভয়েল উত্তর দিল, 'আমার বলে এখন মরার সময় নেই, বেনাচিতিতে একটা ওয়াড্রোব করাতে দিয়েছি, সেই ডিজাইনটাই আমার মাথায় অহরহ ঘুরছে।

তার পাশে এক পিওর সিল্ক বলল আমাকেই, 'মশাইতো সাহিত্য-টাহিত্য করেন শুনেছি, দু'একটা গল্পটল্প ছাড়ুন না।'

'সাহিত্য থাক, আপনি বরং আপনার বিয়ের গল্প বলুন', বললাম আমি।

'সেসব কী শুনবেন, সব পুরনো হয়ে গেছে', মনে পড়ল বছর চারেক আগেও বিয়ের গল্প বলতে বললে কেমন উৎসাহিত হয়ে উঠতেন তিনি, না খাইয়ে ছাড়তেন না।

এবার এক নীল টাইকে লক্ষ্য করে বললাম, 'তবে তুই কিছু বল।'

'আমি তো ভাই অনেক চেষ্টা করেও মোল্ড হট্-টপ আর স্টপাররড ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

'স্টিল গ্রে টেরিউল, তুই বল।'

'আমার কানে সবসময় একজস্ট পাইপের সোঁ সোঁ। চিন্তাভাবনার সময় কোথায়।'

'ভাই নীল ব্লেজার, তুই ?'

'হাতের দিকে তাকালেই মনে হয় মাইক্রোমিটার দিয়ে যেন ব্লাকশীটের গেজ মাপছি।'

'তুই ?' উদ্দিষ্ট এক কাঁচাপাকা চুল, চুস্ত পাঞ্জাবী।

'আমার অফিসে বিস্তর ফাইল জমে গেছে। অডিটের আগে সেসব ক্লিয়ার না করা পর্যন্ত নিস্তার নেই। তাই…'

'বুঝেচি, তুই ?'

'বাজারে বেবিফুডের বড স্কারসিটি চলছে, তাই কথা বন্ধ।'

সেই মুহূর্তে আমার মনে হোল সারা ঘরটা যেন কিছুক্ষণের জন্য পাল্টে গেল। একটা বিভীষিকাময় কারখানায় আর পুরো ঘরটা যেন ভবে গেল বিলেটের ঝনঝন, গ্রাইণ্ডিং হুইলের গুঁডো আর রিহিটিং ফার্নেসের উত্তাপে। আমার সারা বুক নিংড়ে শূন্যতার অন্ধকার স্রোত বেরিয়ে এল একটি দীর্ঘায়িত নিঃশ্বাস হয়ে।

কারখানার বিষাক্ত নিঃশ্বাস ভেতরে ভেতরে মাটি খেতে খেতে এমন করে আমাদেব নিঃস্ব করে দিয়েছে একদম বুঝতে পারিনি।

ইতিমধ্যে আর একপ্রস্থ চা বিলি হয়েছে। একহাতে দামী চায়ের কাপ, অন্যহাতে দামী সিগারেটেব আগুনে মুখ নিয়ে গভীর চিন্তায় ডুব দিয়ে আমি নিষ্কৃতির উপায় খুঁজছিলাম। ছোট বেলায় শোনা ঠাকুরমার গল্পের সেই অভিশপ্ত মন্ত্রীপুত্রকে মনে পডল। ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর গোপন কথা বলে দেওয়ার পাপে সে পাথর হয়ে গিয়েছিল। তার বন্ধু রাজপুত্র তাকে বাঁচিয়েছিল কঠোর তপস্যা করে মন্ত্র এনে। মন্ত্রবলে পুরো একটা নদীর স্রোতধারা পাল্টে এনে বইয়ে দিয়েছিল সে বন্ধুর পাথর শরীরের ওপর দিয়ে। আমাদের এই বারো জোড়া ফসিলকে কে বাঁচাবে ? কীভাবে বাঁচাবে ? কোন মন্ত্রের সোনার কাঠি রূপোর কাঠিব ছোঁয়ায় জাগবে আমাদের প্রাণভোমরা তা আমাদেব কারুব জানা নেই।

অনিমেষ নিঃশব্দে বসে আছে। সাদা পাঞ্জাবীর ওপর পরিপাটী নস্যিরংয়া শালটি থলথলে ঘাডঘুরে পিঠের প্রান্ত পযন্ত চলে গেছে। বটমহোলে ঝকমক করছে সোনার বোতামগুলি। তীক্ষ্ণ নাকটি তক মেদাধিক্যে চকচক করছে। তবুও, এখনো পর্যন্ত আমাদের মধ্যে অনিমেষকেই খানিকটা শিল্পী শিল্পী লাগে। রুরকেল্লাব ট্রেনিং শেষ করে দুর্গাপুর চলে আসার পরও অনিমেষ সময় পেলেই বাঁশি বাজাত। গভীর রাত্রে অনিমেষের কোয়ার্টারের পাশ দিয়ে যাবার সময় কখনো কখনো শুনেছি আড়বাঁশির চাপা করুণ সুর, 'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে⋯এখনো বাঁশি বাজায় কিনা, সে আমার জানা নেই। কারখানার যে যায়গাটায় আমার কাজ, সেখানকার বিদ্যুৎ চলাচলে বিঘ্ন ঘটলে মাঝেমাঝে অনিমেষকে ডাকতে হয় ফোনে।

'হ্যালো অনিমেষ, মেইন কণ্ট্রোলে পাওয়ার পাচ্ছিনা কেন ?'

'সাপ্লাই কম আছে।'

'তা জানি, কিন্তু জি. এস. এর স্পেশ্যাল পারমিশন আছে আমাদের পাওয়ার পুরোই দিতে হবে। ফিফটি পার্সেন্ট বোনাস রান করছে আমাদের এসময়...''

আমার ক্রুদ্ধ কণ্ঠ থামিয়ে উত্তর দেয় অনিমেষ, 'আমাকে বলা কেন, ওপর ওয়ালাদের বল।'

এরপর ফোনের ভেতর দিয়ে তর্কের ঝড় ওঠে। যেসব কথাবার্তা হয় তার মধ্যে লোড শেডিং ভোল্টেজ, ওয়াট, এ্যামপিয়ার এসব কথাগুলোই, ঘুরেফিরে আসে। বাঁশির কথা আর মনে পড়ে না।

এখন অবশ্য অনিমেষ শাল পাঞ্জাবী আর চোখের দৃষ্টিতে তার ইলেকট্রিক্যাল চার্জম্যানের পরিচয় মুছে ফেলতে পেরেছে। আমার খুব লোভ হচ্ছিল অনিমেষের এই গম্ভীর চেহারাটার ভেতর থেকে দশ বছর আগেকার সেই প্রাণোজ্জ্বল অনিমেষকে টেনে বার করে আনতে। অনেকটা মরিয়া হয়েই প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলাম,

'অনিমেষ ভাই, তোর, বাঁশি আনিস নি আজ?'

প্রত্যুত্তরে অনিমেষ ম্লান হাসল। চারপাশের ফসিলদের চোখে জমাট উৎসাহের ছোঁয়া লেগেছে দেখে বুঝলাম টোপটায় কাজ হয়েছে। আমি আরও উৎসাহের সঙ্গে বললাম, 'সত্যি অনিমেষ, আজ তোর বাঁশিটা থাকলে খুব ভালো হোত।'

'বাঁশি কে শুনবে বল!' অনিমেষের গলায় অভিমান।

'কেন, আমবা শুনব, আমরা সবাই শুনব।' নীল টাই বলল আন্তরিক উৎসাহে।

আমি আর একটু এগিয়ে গেলাম, 'সাইকেলে করে কেউ গিয়ে নিয়ে আসি তাহলে বাঁশিটা।'

এতক্ষণে সত্যিকার তৃপ্তির হাসি ফুটল অনিমেষের মুখে, 'সত্যিই তাহলে শুনবি বলছিস। আচ্ছা, তাই হোক?' বলে সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে অনিমেষ গেঞ্জির তলা থেকে টেনে বার করল ছোট একটি আড় বাঁশি। তারপর বলল, 'কী বাজাব বল?'

আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'নূতন যুগের ভোরে...'' মনে আছে? সেই ক্লাবকেল্লায় একত্রিশে ডিসেম্বর রাত্রে বাজাতিস?'

অনিমেষ দুহাতে বাঁশি ধরে ফুঁ দিল।

তারপর, একটার পর একটা। 'গ্রামছাড়া এই রাঙামাটির পথ......',

'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে', কত গান। বিরাট জলাধারের নির্গমনমুখ হঠাৎ খুলে দিলে প্রাণ চাঞ্চল্যে জলধারা যেমন পৃথিবী মাতায়, আমাদের দশ বছর আগেকার রুরকেল্লার হোস্টেলের জীবন বিস্মৃতির পলি সরিয়ে তেমনি জেগে উঠল হঠাৎ হুড়মুড় করে। যে এতক্ষণ একজস্ট পাইপের সোঁ সোঁ ছাড়া কিছু শুনতে পাচ্ছিল না, বলে উঠল, 'সেক্টর সেভেনের সেই হোলি খেলা মনে আছে তোর? গামছায় হার্মোনিয়াম বেঁধে রঙের বালতি, আবির নিয়ে· আর সেই গানটা, "মালা দিবগো দিবোগো কাহারো গলে এ-এ", উচ্ছ্বাসে স্বর করে গেয়েই দিল খানিকটা সে।

তাব এল প্লাবন। নীলটাই বলল, 'তুই ব্যাট করতে নামলেই আমি যেতাম বল করতে মনে পড়ে অনিমেষ? আর প্রথম বলেই ' একটা গভীর আত্মতৃপ্তির হাসি হাসল সে। আমাদের রুরকেল্লার হোস্টেলে রবিবার ববিবাব মুরগীর মাংস হোত। পাতে মুরগীর ঠাং পাওয়া নিয়ে তাই ভেতরে ভেতরে সেদিন চলত আমাদের প্রতিযোগিতা। একজন বলল তার সেই কৌশলটা, কীভাবে সে প্রায়ই মুবগীর ঠ্যাং বাগাত। তর তর করে এগিয়ে চলেছে সময়। হুঁস নেই আমাদের। গল্প গান আব হাসিব হুল্লোড়ে খানিকক্ষণ আগেকাব শ্মশানের স্তব্ধতা কোথায় যে ভেসে গেছে কে জানে। উৎসাহের আতিশয্যে একমনা সেক্টব এইটিনে তার একটি মেয়ের সঙ্গে কী করে ভাব হয়েছিল সে কথা বলে ফেলেছিল। সেকথা নিয়ে পাশে বসা নীল বেনারসীটির সে কি কটাক্ষ! অনেকক্ষণ উপভোগ করল সবাই ব্যাপারটা। চুস্ পাঞ্জাবী হুস্ করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, দশবছর আগে যখন রুরকেল্লার পাহাড় টপকে হোস্টেলে ফিরতাম, ভাবতাম, দিনগুলো বুঝি কখনো শেষ হবেনা। আর আজ! পাশে বসা এক কনকচাঁপা টেরিভয়েলের দিকে তাকিয়ে রইল সে।

অনিমেষ হাত তুলে থামতে ইশারা কবল সবাইকে। বলল, 'দয়া করে এই গানটা বাজাবার সময় কেউ কথা বলবেন না,' তারপর নিজেই লাইটের সুইচটা অফ করে দিয়ে নীল ডিম আলোটা জালিয়ে নিল, তারপর ফুঁ দিল বাঁশিতে।

'এবার নীরব করে দাও হে তোমার মুখর কবিরে', অনিমেষ ধরল তার প্রিয়তম গানটি। জমাট কান্নার করুণ আকুতির মত বাঁশীর কখনো ভরাট, কখনো তীক্ষ্ণ ধ্বনি, ভাঁজে ভাঁজে হালকা শরতের মেঘের মত ছুঁয়ে ছেনে যেতে লাগল আমাদের ইস্পাতের কারখানায় ছাঁচে ঢালাই করা কঠিন শীতল মনকে।

প্রতিটি স্বরগ্রাম তীরের মত এসে আঘাত করছিল অনেক দিনের অব্যবহৃত মরচে পড়া অনুভূতির দুয়ারে। আমরা জাহাজ ডুবির ভাগ্যহীন নাবিকদের মত অক্সিজেনের জন্য হাহাকার করছিলাম। বহুক্ষণ ধরে আমাদের নাড়িয়ে ঝাঁকি মেরে, ঝড় যেমন করে শুকনো পাতা উড়িয়ে নিয়ে যায় তেমনি করে বহুক্ষণ ধরে আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একসময় গান শেষ করল অনিমেষ।

বাক্যহীন সকলে আমরা যেন সমাধিতে বসেছি। দশ বছর অতীতের ঘটনাবলী স্রোত হয়ে এখন বয়ে যাচ্ছিল আমার শিরদাঁড়ায়। আমরা তাহলে এখনো মরিনি। শুধু বছরের পর বছর কারখানাটা জোর করে আমাদের ওপব খানিকটা করে যান্ত্রিক অভ্যাসেব পলি ফেলে গেছে।

আমার চিন্তায় ছেদ পডল। নীলটাই উঠে দাঁডিয়েছে গোলাপী র'কটনের হাত ধবে, 'চলিরে, কাল আবার মর্নিং শিফট।' আমি বিস্মিত হলাম। ইতিমধ্যে তার মুখ থেকে উৎসবের আবহাওয়া সরে গিয়ে উঁকি মারতে সুরু করেছে ফসিলের মুখ। আস্তে আস্তে সেই ফসিলটা বোতলের দৈত্যেব মত বাড়তে বাড়তে একে একে অধিকার করতে চেষ্টা করছে আমাদের। উৎসবেব স্রোতটাকে মারণ উচাটন বশীকরণ মন্ত্রসিদ্ধ কোন তান্ত্রিক যেন 'তিষ্ঠ' বলে কবে দিয়েছে স্তব্ধ।

জোড়ায় জোড়ায় উঠে যাচ্ছে একের পর এক। যেন অমোঘ অদৃশ্য শিকলের টান টেনে নিয়ে চলেছে সকলকে। নৈঃশব্দ্য দ্রুত ছুটে আসছে। তাদের শূন্যস্থান দখল করে নিচ্ছে।

একে একে উঠে গেল সব। শুধু অনিমেষ আর আমি মুখোমুখি। অনিমেষ ধীরে সুস্থে বাঁশিটি গেঞ্জির মধ্যে লুকিয়ে নিল। তারপর উঠে দাঁড়াল। অতি দ্রুত তার মুখ পাল্টে যাচ্ছে। সৌম্য শিল্পীর বদলে রেখায় রেখায় আত্মপ্রকাশ করছে ফসিলেব রুক্ষ রূঢ়তা।

হঠাৎ অনিমেষ আমার দিকে তাকিয়ে খাঁটি চার্জম্যানের গলায় বলে উঠল, 'চল এবার ওঠা যাক।' []

লটারি

—এই যে দাদা শুনুন।

একটা ব্রেক কষে দাঁড়ালো ভদ্রলোক, আমাকে বলছেন ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আপনাকেই।

চকিত জরিপে ভদ্রলোককে আপাদমস্তক মেপে নিল ছেলেটি। ধীরেসুস্থে পকেট থেকে একটা ছাপানো বিল বই বার করে এগিয়ে দেয়।

—এক টাকার লটারির টিকিট নিন। টাকায় পাঁচটা।

—লটারি! ভদ্রলোকের বিরক্তি গোপন রইল না, লটারির টিকিট আমি কিনি না। ছেলেটি তৎক্ষণাৎ মুখে যথেষ্ট করুণভাব ফুটিয়ে বলল, আসলে এটা একটা সাহায্য। আমরা কয়েকজন মিলে একটা সঙ্গীত প্রতিষ্ঠান করেছি। তারই সাহায্যের জন্য আর কি -আর ফাঁকতালে—

—না, এসব লটারি নেব না।

—কেন দাদা ? আমরা গরীব বলে ? আমরা আপনার কাছে ভিক্ষে চাওয়ার মত চাইছি বলে ?

ভদ্রলোক যেহেতু সত্যিকারের ভদ্রলোক সুতরাং যথারীতি অপ্রস্তুত।

না, মানে, এসব শুধু পয়সা লোটার ব্যাপার, লটারি সত্যি সত্যি হয় না।

এবার ছেলেটি পা-রাখার মাটি পায়।

—আচ্ছা বেশ। আপনি শেতলা পার্কের মনমোহন বাবুকে চেনেন তো ? উনিই আমাদের লটারি পরিচালনা করবেন। আগামী রোববারেই খেলা শেতলা পার্কেই। সকাল বেলায় আসুন না, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন সব কিছু।

ভদ্রলোক কিছুটা নিজের কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্তের জন্য, কিছুটা এর হাত থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পকেট থেকে নিঃশব্দে একটি টাকা বের করে দেয়। তারপর ঠিকানাটা বলে এবং পাঁচখানা রঙিন ফুরফুরে টিকিট নিয়ে চলে যায়। একটা টাকার জন্য মনটা একটু খচখচ করে, তারপর ভুলে যায়।

রবিবার। ঘুম থেকে উঠতে বেশ দেরিই হোল। বাজার সেরে ফেরার পথে ঠিক সেই জায়গাটাতেই আসতে মনে পড়ে যায় শেতলা পার্কের লটারি

খেলা। কেমন একটা কৌতূহল ছিল। বাজারের থলিটা রেখে আবার বেরোল সে। স্ত্রী বলল, আবার কোথায়?

ঠোঁটের ডগাটা চেপে সত্যি কথাটা আটকাল সে। বলল, একটু কাজ আছে।

পনের মিনিটের পথ। শতখানেক লোক এধার ওধার। একটি ছোটখাটো প্যাণ্ডেল। কোট-প্যাণ্ট-টাই পরা এক ভদ্রলোক। উনিই বোধ হয় সেই—কি যেন নাম। একটা ব্ল্যাকবোর্ডে কতকগুলি নম্বর। পাশে কিছু নাম ঠিকানা। ভদ্রলোক অবাক। তার নামটা এক নম্বরে। সেই ছেলেটি ছুটে এল। চিনতে পারল এই যা। তারপর আরো ঘণ্টাখানেক লাগল, চা আপ্যায়ণ—কাগজে সইটই। একটি ছ' লিটার প্রেসার কুকার কাগজের বাক্সে মুড়ে ভদ্রলোক বাড়ির দিকে হাঁটা দিল। কি ভারী! যখন বাড়িতে পৌছল, তখন কপালে গলায় গেঞ্জিতে শুধু ঘাম।

ছোট ছেলেটা ছুটে এল—বাবা! বাবা!

স্ত্রী কি একটা বলতে রান্নাঘর থেকে বেরিয়েই মোড়কটা দেখে অবাক। বহুদিন থেকে তার এক নম্বর বায়না। খুশিতে ঝলমলিয়ে, ভুলে যাওয়া পুরাতন গরবী গলায় বলল, কত নিল? হঠাৎ এই মাসের শেষে?

ভদ্রলোক একগাল হেসে বলল, কিনিনি। সেই যে লটারির টিকিট কিনেছিলাম···ফার্ষ্ট প্রাইজ।

ইতিমধ্যে খোকন মোড়কটা খুলে ভেতরের চকচকে পাত্রটা বার করে ফেলেছে। ভদ্রমহিলা হাঁ হাঁ করে ওঠে সব গুছিয়ে তুলতে তুলতে বলে, রাত্রে মাংস নিয়ে এস। আজই উদ্বোধন হয়ে যাক।

একটি দশ বাই বারো আর একটি দশ বাই আট, দু' কামরার ঘর। এক ফোঁটা বারান্দাতেই রান্নাঘর কাম ডাইনিংরুম। সাধারণ আর পাঁচজন নিম্নবিত্ত চাকুরের ঘরের মতই। আর পাঁচজন চাকুরের স্ত্রী মতই ভদ্রমহিলার বুকে অপূর্ব কামনাগুলি ডানা ঝটপট করে। চৌকির উপর হালকা তোষকের বিছানা থেকে উঠে আসা ভ্যাপসা গরমটাকে তালপাতার পাখার আঘাতে তাড়াতে তাড়াতে ভদ্রলোক বলল, যাক তোমার একটা সখ তবু মিটল!

আহ্লাদে ভদ্রমহিলার ইচ্ছে করছিল স্বামীকে জড়িতে ধরতে, কিন্তু না—নিচে ছোট তক্তপোষে দু' ছেলে তখনো জেগে।

নরম স্বরে শুধু বলল, ভগবান তো সব বোঝেন, যে এমনিভাবে পাইয়ে

না দিলে আমাদের কেনার ক্ষমতা হোত না।

—ও কথা বোলো না। একবার তো ভেবেই ছিলাম পুজো বোনাস পেলে একটা প্রেসার কুকার কিনব।

—তা বেশ তো প্রেসার কুকার তো হয়ে গেল, এবার ড্রেসিং টেবিল কেনো।

—ড্রেসিং টেবিল? রাখবে কোথায়?

—সেটা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমি ঠিক কুলিয়ে নোব।

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের শব্দ ওঠে।

ভদ্রমহিলা হতাশকণ্ঠে বলে, তুমি কিনবে ড্রেসিং টেবিল, তবেই হয়েছে। যা কিপ্‌টে লোক তুমি!

—সত্যি বলতো, ড্রেসিং টেবিলের মত জিনিষের আমাদের কোন প্রয়োজন আছে?

—না, তোমার ঐ ফাটা হাত আয়না আব রবারেব চিরুনি অক্ষয় হোক। ড্রেসিং টেবিলের আর প্রয়োজনটা কি?

গত মাসে ছোট বোন এসেছিল বেড়াতে। সেও দু' একবার শুনিয়ে গেল, দিদি ড্রেসিং টেবিল ছাড়া তোর চলে কি করে রে। অথচ ওর স্বামী তো মুদীর দোকান করে একটা। তার ঘবে ড্রেসিং টেবিল তো অনেক আগেই ঢুকেছে। এবার নাকি ফ্রিজ কিনবে ওবা।

ভদ্রমহিলা বলে, শুনেছ নমিতারা সামনেব মাসে ফ্রীজ কিনছে!

—কিনতে পারে, সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে ভদ্রলোক পাশ ফিরে শোয়।

কিনতে পারে' সবাই সব কিছু পারে, আর তুমি কিছু পার না। কথা শুনে গা জ্বলে যায়। ঘরে ঘরে কত যে উপকবণ, দোকানে দোকানে থরে থরে এত যে জিনিষ সাজানো, খবরের কাগজে এত যে বড বড বিজ্ঞাপন সে তো মানুষের জন্যেই মানুষে কিনছে বলেই। তার জন্যে শুধু খেটে খেটে হাড কালি করা আর দোকানভরা জিনিষের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকা। আর প্রতিবেশীদের এমন গা-জ্বালানো স্বভাব, কেউ কিছু কিনল তো তক্ষুনি হেসে হেসে খবর দিতে চলে আসবে, দিদি জানেন অমুক জিনিষটা কিনে ফেললাম— কিনবেন তো বলুন, হাতে আছে সস্তায় ভালো জিনিষ। ভদ্রমহিলাকেও হাসি হাসি মুখ করে বলতে হয়, আর ভাই কিনিনি কি সাধে, রাখার জায়গা কোথায়। এই দেখুন না একটা বড় বাড়ির জন্য উনি কত চেষ্টা করছেন কিন্তু পাচ্ছি কই?

বাড়ি পাওয়া যাচ্ছে তো পাড়াটা ভালো নয়, আর ভালো পাড়ায় হলে ওনার অফিস থেকে বড্ড দূর পড়ে যাচ্ছে।

বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ভদ্রলোক একদিন একগোছা লটারির টিকিট এনে স্ত্রীকে দেয়।

—কি এগুলো ?

—এবার ড্রেসিং টেবিল।

—হ্যাঁ, একবার লেগেছে বলে বারবার!

বলল বটে, কিন্তু বুকের ভিতরটা কিরকম যেন গুরগুর করে উঠল।

—পাঁচটা বই থেকে এখান ওখান এক টাকার করে মোট পাঁচ টাকার টিকিট!

—তাই নাকি ?

—শুধু তাই নয়, এরও খেলা হবে রোববার।

—আচ্ছা তারিখটা মিলিয়ে ছাখতো।

ব্যাক ক্যালকুলেশন করে দেখা গেল প্রেসারকুকারের দিনটা ছিল একুশে সেপ্টেম্বর' এই টিকিটে লেখা খেলার তারিখ একুশে ডিসেম্বর। ভদ্রমহিলার টিকিট ধরা হাতটা এত কাঁপছিল যে মনে হচ্ছিল যেন বাতাসে বাঁশপাতা উড়ছে।

ঐ যে একটি বীজ ঢুকে পড়ল তার মনে, বঞ্চিত হৃদয়ের অনুকূল পরিবেশ আর ভদ্রলোকের অনবরত জলসেচনে তা ক'দিনেই বেড়ে উঠে পুরোপুরি তাকে অধিকার করে বসল।

সাতটা দিন যেন আর কাটতে চায় না। ইতিমধ্যে কতবার যে ড্রেসিং টেবিল রাখার জায়গা ঠিক হয়েছে আর বদল হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। প্রাইজের জিনিষ সুতরাং খাঁটি সেগুন যে হবেনা সেতো জানা কথা। পালিশ চটে যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। এরকম সম্ভব-অসম্ভব নানা কথা ভদ্রমহিলার মাথায় ঘোরাফেরা করে।

শুক্রবার থেকে প্ল্যান হয়ে রইল, রবিবার সকালে ভদ্রলোক একাই প্রেসার-কুকারে ফোটানো চারটি আলুসেদ্ধ ভাত খেয়ে রওনা হবেন। কেননা জিনিষটা আনার অনেক হ্যাজাম আছে, ভদ্রমহিলারও যাবার ইচ্ছা, কিন্তু অসুবিধার কথা ভেবে ইচ্ছা বাতিল।

শনিবার ভদ্রলোক অফিস-ফেরত একরাশ পাউডার-স্নো ব্রাশ চিরুনী ইত্যাদি কিনে নিয়ে এলেন। হাসিমুখে চা'র কাপ হাতে এগিয়ে দিতে গিয়ে ভদ্রমহিলা বললেন, আজ এক কাণ্ড হয়েছে, জানো।

—কি কাণ্ড?

—দুপুরে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়ছি। একটু একটু চোখ লেগে গেছে। স্বপ্নে দেখি, দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ঠকঠক কড়া নাড়ছে। কিম্ভূত পোষাক। আর হাঁকছে টেলিগ্রাম আছে-টেলিগ্রাম আছে। ঘুমটা চট্ করে ভেঙে গেল।

সন্ধ্যাবেলা। ভদ্রমহিলা রান্নঘরে। ভদ্রলোক ছেলে দুটিকে পড়াচ্ছেন আর খবর শুনছেন। বাইরে একটু ধোঁয়াশা ভাব। হঠাৎ দরজায় সত্যিই কড়া নড়ে উঠল। ভদ্রমহিলা ছুটে এল রান্নাঘর থেকে। দু'জনে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। চাদরটা জড়িয়ে ভদ্রলোক উঠে যান।

—আরে তুই, আয় আয়।

ছোট বেলার বন্ধু। লক্ষ্ণৌতে থাকে। অফিসের কাজে হঠাৎ আসা। ঠিকানাটা ছিলই। আর ছিল অনেক দিনের আমন্ত্রণ। হঠাৎ যখন সুযোগ এল ঠিকানা মিলিয়ে চলে এসেছে।

বিয়ের পর এই প্রথম আসা। যথাসাধ্য খাতির-যত্ন হাসি তামাসা হোল। কিন্তু জানা গেল রবিবার বিকেলেই বন্ধুকে চলে যেতে হবে।

রবিবার। সকালে জলখাবার পাট চুকল। স্বামীস্ত্রী দু'জনে ঘনঘন চোখে চোখে পরামর্শ হচ্ছে কি করা যায়। আজ ভাল করে বাজার-টাজার করতে হবে। অথচ লটারির ওখানে না গেলেও ভারি অস্বস্তি। বন্ধু একটু বাজারের দিকে যেতে চায়, কিছু কেনাকাটা আছে। কি করা যায়।

ভদ্রলোক বারবার ঘরে ঢোকে আর বেরোয়। এই তো এইটুকু তফাৎ। চাপা গলায় কথা বললেই কি ছাই চাপা থাকে! উপায় নেই।

—তুমি বাজারে চলে যাওনা, ভদ্রলোকের গলা।

—আমি মাংসের বাজারে ঢুকতে পারিনা। গা গুলোয়। ভদ্রমহিলার করুণ কণ্ঠ।

—তবে মাছই এনো।

—যদি পচা হয়। না বাপু ও আমি পারব না।

—পারতেই হবে।

উত্তেজনায় গলার স্বরটা বোধহয় একটু চড়েই গেছল। বন্ধু ওঘর থেকে চেঁচিয়ে উঠল, কিরে তোরা এই সকাল বেলাতেই ঝগড়া শুরু করে দিলি নাকি?

লজ্জা লজ্জা মুখে ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন।

—আরে না-না, সে একটা ব্যাপার হয়েছে।

—কি ব্যাপার?

—চল, বেরোই। যেতে যেতে বলছি।

রাস্তার মোড়ে ভদ্রলোক একটা রিক্সা করলেন। বন্ধুকে বললেন, চল।

—আমরা কি বাজারে যাচ্ছি?

—না। বললাম না, একটা ব্যাপার আছে!

তখন থেকে তো খালি ব্যাপার-ব্যপার করে চলেছিস। আর কিছু বলছিস না।

—ব্যাপার হোল গিয়ে, একটা লটারী।

—লটারী! কিসের লটারী!

উত্তরে ভদ্রলোক একগোছা ফুরফুর রঙিন কাগজ পকেট থেকে বার করে বন্ধুর হাতে দিলেন। রিক্সা গড়িয়ে চলেছে মসৃণ রাস্তায়। দু'পাশে সুদৃশ্য লনওয়ালা জানালায় ঝুলছে রং বেরং পর্দা। শিরশিরে শীতের হাওয়ায় কাঁপছে টিকিটগুলো। উড়ছে বন্ধুর শ্যাম্পু করা রুক্ষ চুল।

বন্ধু রঙিন কাগজগুলি ফিরিয়ে ছায়। বলে, কিছুই বুঝলাম না।

ভদ্রলোক টিকিটে ছাপা তারিখটা দেখায়। বলে, আজই খেলা, এই ছাখ। ফার্স্ট প্রাইজ ড্রেসিং টেবিল—

—ও, আচ্ছা, তাই তো দেখছি।

—…সম্ভবতঃ আমরাই পাচ্ছি।

—কি করে জানলি?

তখন ভদ্রলোক একে একে সব ঘটনা বলে যায়। বারের মিল, তারিখের মিল; এমনকি স্বপ্নের কথাটাও বাদ গেল না!

বন্ধু গম্ভীর ভাবে বলে, তাহলে তোর মিসেস একেবারে সিওর যে তোরাই ফার্স্ট প্রাইজ পাচ্ছিস।

—হ্যাঁ, ওভার সিওর।

—আর তুই?

—আমি মানে এসব ঠিক বিশ্বাস করিনি কোনদিন। কিন্তু কি জানিস

তো, কখনো কখনো এসব আবার ফলেও যায়।

—হুঁ, বুঝেছি।

যখন তারা পৌঁছল, খেলার দেরি আছে। দু'জনে অল্প দূরে একটা বাঁধানো বেঞ্চে বসল। ঘাসের আগায় তখনো শিশির। শীতের পরিষ্কার আকাশে মিষ্টি রোদ।

বন্ধুর দিকে সলজ্জ হেসে ভদ্রলোক বলে, আমাদের পাগলামি দেখে তুই নিশ্চয় মনে মনে হাসছিস।

—হেসে কি করব! সারা দেশ জুড়েই তো এই। সবাই চাইছে সস্তায় বাজিমাৎ করতে। লটারি এখন আর এণ্টারটেনমেণ্ট নয়—নেশা।

—ঠিক বলেছিস। মাসিক বাজারের ফর্দে চাল, তেল, নুন ইত্যাদির পরই দু'একটা লটারির টিকিট।

—কিন্তু মজা হোল লক্ষ জনা টাকা হারালে তবেই না একজন টাকা পাবে! এ যেন যুধিষ্ঠিরের সেই 'কিমাশ্চর্যম্'। সবাই ভাবছে আমিই এবারের ভাগ্যবান।

কিন্তু সমস্ত স্বপ্ন, ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা করে দিয়ে দেখা গেল ভদ্রলোক প্রথম পুরস্কার তো নয়ই, সান্ত্বনা পুরস্কারও পায়নি। অনেকবার বৃথাই এধার-ওধার দৌড়ে বেড়াল সে। এ যে অসম্ভব। কিন্তু নিজের চোখের সামনেই সব কিছু ঘটেছে। নিয়মের কোন বিনতিরিজ নেই। বিশ্বাস না করার কোন হেতু নেই। বেচারীর অবস্থা করুণ। এই কারণহীন শোকের সান্ত্বনা কি?

কিছুক্ষণ ওরা ফের বেঞ্চে বসে রইল। কিন্তু রোদ এখন আর মিষ্টি নয়। বন্ধু ইতস্ততঃ করে বলে, আমার কিছু কেনাকাটা ছিল।

—হ্যাঁ, চল।

বলল বটে, কিন্তু ওঠার লক্ষণ দেখা গেল না।

—ছি, এসব আশা করাটাই খুব খারাপ। গিন্নী শুনে কি করবে কে জানে।

—উনিও ব্যাপারটা খুব সিরিয়াসলি নিয়েছেন?

—দারুণ!

পায়ে পায়ে হাঁটতে থাকে দু'জনে। হঠাৎ ভদ্রালোক থমকে দাঁড়ায়।

—আচ্ছা শোন।

—কি ?

—তোর কাছে টাকা আছে ?

—কত ?

—ধর শ'তিনেক।

—কিন্তু…

ভদ্রলোক বন্ধুর হাত চেপে ধরে, প্লীজ হেল্প…কোন কিন্তু নয়। তোকে আমি টাকাটা পরে পাঠিয়ে দেব।

*　　　*　　　*

ভ্যানওয়ালার সহায়তায় ভদ্রলোক যখন ড্রেসিং টেবিলটা নামিয়ে আনলে ভদ্রমহিলা সহজ ভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল যেন সব কিছু হিসেব করা। তার বাইরে কিছু ঘটেনি। জায়গা সে আগেই ঠিক করে রেখেছে।

বন্ধু বাইরে জুতো খুলছে। ভদ্রমহিলা চোখের কোণে দৃষ্টি হেনে বলল, কি মশায়, আমার কথা বিশ্বাস হোল তো এবার ?

গম্ভীর জবাব এল—হুঁ।

—এরপর কিন্তু ফ্রীজ…

মনে হোল ভদ্রলোক যেন কেঁপে উঠলো একটু। কোন উত্তর না দিয়ে বেরিয়ে গেল সে। []

খাদ্য

॥ এক ॥

সরু করে চেরা তালপাতায় বোনা তালাই-এর চারকোণে চারটে হ্যারিকেন জ্বলছিল। মাথার উপর আটচালাটার নীচু খোড়ো চাল যেন জাপটে ধরে রেখেছিল ভেতরের গুমোট গরমটাকে। আটচালাটার চারপাশ খোলা তবু একবিন্দু কোথাও বাতাস নেই। পাশের সারকুড় থেকে শুধু ভেসে আসছিল সদ্য কেটে তোলা গোবরের একটা পচা বুকচাপা গ্রাম্য গন্ধ—তার সঙ্গে মিশছিল লিলি পোকায় ছাওয়া সবুজ ডোবার জলের গন্ধ। খানিকক্ষণ আগেই সন্ধ্যার মুখে ঘরে ফেরা গরুবাছুরের ক্ষুরে ক্ষুরে ওড়া ধুলোর সূক্ষ্ম গন্ধ তখনো ভাসছিল বাতাসে। এসব গন্ধই এখানে এত সাধাবণ আর এত প্রত্যাশিত, নাক এসবের সঙ্গে এতই পরিচিত যে, বিশেষভাবে ব্যবহৃত না হলে সে আর এদেব উপস্থিতির খবব মস্তিষ্কে পাঠায় না। সেই আটচালায়, তালপাতার তালাইএ বসে বসে আলোচনারত লোকগুলি ঘামছিল। তাদের কপাল আর অনাবৃত উর্দ্ধাংগ বেয়ে গডিয়ে পডা ছোট ছোট ধাবা ভূষোপড়া হ্যারিকেনের লাল আলোতেও চিকচিক করছিল।

আটচালা ছেডে বিশ হাত পর থেকেই বৃত্তাকারে শুরু হয়ে গিয়েছে পাড়া—চাপবন্দি মেটে ঘরের সাব। একেবারে গায়ে গায়ে লাগাও, চালেচালে ঠেকাঠেকি। হঠাৎ আগুন লাগলে নেবানো তাই মুস্কিল হয়ে পডে। পুলিশ এসে পাডা ঘিবে ফেললে, কোন ঘরটি কার খুঁজে পেতে তাই বেশ বেগ পেতে হয়।

তালাইএর এক প্রান্তে থামে ঠেস দিয়ে বসা চাচার মুখে আলো পড়ে চোখের কোটর আর গালের গর্তে অন্ধকার তৈরী করেছিল। তার সামনে বসা লোকটি অপেক্ষাকৃত বলিষ্ঠ। খোঁচাখোঁচা কাঁচাপাকা দাড়ি আর কালো বুকের গভীর গর্তে একগাদা লোমে তাকে আরও বীভৎস লাগছিল। সে এখানকার প্রাইমারী ইস্কুলের মাষ্টার। আশপাশের দশটা গাঁয়ের ছেলেমেয়ের বাবারা তাকে চেনে,

খাতিরও করে। এতগুলি লোকের সামনে চাচা তার সেই খাতিরের দেওয়ালটায় বারবার আঘাত করছিল, আর মাস্টার আহত নেকড়ের মত গর্জন করে উঠছিল। যুক্তির অভাবটা তাকে পোষাতে হচ্ছিল গলার জোর দিয়ে। শেষ পর্য্যন্ত চাচার শান্ত নিরীহ মুখের উপর তার শেষ কথাটা ছুঁড়ে দিল মাস্টার, চাল আমরা বাইরে যেতে দিব নাই, তুমি যাই বল আর তাই বল। দরকার পড়লে আমরা ক্কইখব—ঘরে ঘরেই রক্তারক্তি হয় হবেক। ইটোই আমাদের শ্যাষ কথা জানবে।'

মাস্টার তার হাত পা নাড়া, চোখমুখের ভাব, গলার স্বর সবকিছু দিয়ে যতদূর সম্ভব চ্যালেঞ্জ জানিয়ে চলে গেল। তার পিছন উঠে গেল আরো কয়েকজন লোক। তারা সব মাস্টারের দলের।

হ্যারিকেনের দোদুল্যমান আলোতে আস্তে আস্তে দূরে চলে যাওয়া কতকগুলো পায়ের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে ছিল চাচা, জোড়া করা হাঁটুর উপর থুতনি রেখে। দেখছিল আলোটা আস্তে আস্তে যতদূরে সরে সরে যাচ্ছে অন্ধকার কেমন পূরণ করে দিচ্ছে জায়গাটা।

সময় নেই। আজ আর কাল। চব্বিশ চব্বিশ আটচল্লিশ ঘণ্টা মাত্র হাতে আছে। তারপরই মাথাটা দেওয়ালে ঠুকেঠুকে ছাতু করে ফেললেও কোন উপায় থাকবে না আর। চাচা মুখ তুলে তাকাল আর একবার। একটি মাত্র হ্যারিকেনের আলোয় ঘেরা বসে থাকা মুখগুলির দিকে। কানাই, চাচার নিজের ছেলে মুস্তাক, উপর পাড়ার বাঘা বাগদি, বাউরী পাড়ার কয়েকজন, জোলা পাড়ার রফিক, আরো কয়েকজন অন্ধকারে ঠিক মুখ চেনা যায় না। জনা দশেক হবে বোধ হয়। থমথমে মুখে সবকটি উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে আছে চাচার দিকে। বিনা বাক্যে চাচা আবার নিজের চিন্তায় ডুব দিল।

অমনি, অন্ধকার আকাশে তারা ফোটার মত তার চোখের সামনে একটি একটি করে ফুটে উঠতে লাগল ক্ষুধার্ত্ত শিশুর মুখ। ফুলের মত মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে—আর সেই শুকনো মুখে জলছে দুটি করে প্রশ্নাতুর চোখ—'পারবে না?' অথচ দূর এমন কিছু বেশী নয়। মাঝখানে একটা ছোটোখাট নদী আছে বটে, কিন্তু এই গরমে সে তো এখন শুকনো। কারখানাটা অবশ্য ঘিরে আছে পুলিশ—রাস্তাতেও নাকি টহল দিচ্ছে তারা। কিন্তু সেদিকটার দায়িত্ব চাচার নয়। ওদিকের ব্যবস্থাটা ওরাই করবে বলেছে—তার দায়িত্ব

শুধু নদীটুকু পর্যন্ত পার করে দেওয়া। বেশী নয়, মণ পাঁচেক চাল হলেও ওরা কোন রকমে সামলে নেবে বলেছে। পুরুষদের নয়, মেয়েদের নয়, শুধু শিশুদের জন্য। শ'পাঁচেক অভুক্ত শিশু বিনা অন্নে আজ দু'দিন হোল ধুঁকছে। আজ সকালেই পুলিশের বেড়া টপকে কোন রকমে একজন এসে যখন তার কাছে দিল খবরটা, সারা শরীর শিউরে উঠেছিল তার। কাঁপতে কাঁপতে রাগে দু'হাতে আপটে ধরেছিল সে টেবিলের পায়া। আগন্তুক ব্যস্তস্বরে বলেছিল, 'পারবেন ? পারবেন আপনি বাঁচাতে শিশুদের ? আমাদের রেশন বন্ধ, জল বন্ধ, বাইরে থেকে লোকজন যাওয়া বন্ধ, ভেতরে থেকে বাইরে বেরনো বন্ধ। কারণ, আমরা কারখানার চাকা বন্ধ করে দিয়েছি। তবু এই অবস্থাতেও আমরা লড়ব, দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়ব। শুধু আমাদের শিশুদের শুকনো মুখ আমরা আর দেখতে পারছি না।'

বহুদিনের অভিজ্ঞতায় ঘন চাচার রক্ত। রাগের উত্তেজনা এতক্ষণে থিতিয়ে এসেছিল। বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে ভাবছিল সে দায়িত্বটার কথা, কাজের কথা। নিজের ঘরে যদি চাল থাকত তাহলে তো কোন কথা ছিল না। অগত্যা চাঁদা। এ গ্রামে প্রায় পাঁচশো ঘর, পাশের গ্রামে চারশো। গড়ে আধ কেজি করে ধরলে সাড়ে চারশো কেজি ।

লাটাইএর সুতোর মত গুটিয়ে আনা চিন্তাটায় ছেদ পড়ে আগন্তুকের উদ্বেগে, "কী ভাবছেন এত ? আপনাদের এত বড় ব্যাপার তবু পারবেন না আপনি ? আপনাদের চোখের সামনে আমাদের চোখের সামনে আমাদের শিশুরা তিলে তিলে শুকিয়ে মরে যাবে এমনি করে ?" চাচা হাত তুলে আগন্তুককে থামায়। জলজলে দুটো আগুনে চোখ তুলে ধরে তার দিকে, তাকিয়ে থাকে পলকহীন চোখে। যেন তার চোখের ভাষা পড়ছে সে। সে দৃষ্টির সামনে আগন্তুক বিহ্বল হয়, বাকাহীন হয়। তারপর কথা আসে চাচার গলায়। প্রতিটি কথা পরিষ্কার জলের মত টলটলে, 'চাল আপনারা পাবেন। কথা দিলাম।' আগন্তুকের চোখ শিশুর মত কখনো লোভাতুর, কখনো কৃতজ্ঞতায় চঞ্চল হয়! কী করা উচিত, কী বলা উচিত, হঠাৎ যেন সবকিছু গুলিয়ে যায় তার। চাচাব অফুরন্ত গলা আবার শোনা যায়, 'নদীর পর তিনখণ্ডীর মাঠ, মাঠের পর শকুনমারির জলা, তার ওপরে কারখানার দিকে যে বটগাছটা, সেখান পর্যন্ত পৌছে দেব আমরা—তারপরের দায়িত্ব আপনাদের ?' চলে যেতে যেতে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেয় আন্তক, 'সময় শুধু আজ আর

কাল—তারপরই কিন্তু সারা শহর মিলিটারীর হাতে চলে যাবে।' চাচা মন দিয়ে শুনল কিন্তু কোন উত্তর দিল না।

তারপর থেকে সেই নির্বাক নিরুত্তরতার পালা এখনো চলছে। মাঝে শুধু একবার, সেই আগন্তুক চলে যাবার পরই, কানাই আর মুস্তাককে ডেকে অতি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিয়েছিল চাচা—তারপর এত যে বাড়ী বাড়ী ঘোরা, মুঠো মুঠো করে চালের বস্তা ভরে ওঠা, সাদা ফুরফুরে নূর দাড়িটি উড়িয়ে হাসি হাসি মুখে সর্বত্র হাজির থেকেছে সে। পাড়ার কোন লোক যদি ব্যাজার হয়েছে, গালাগালি করেছে, তখনো মুখ থেকে হাসিটি সরেনি। পাকা বাঁশের গিঁটগিঁট লাঠির মত ছোট শরীরটিকে সোজা করে প্রয়োজনে কখনো হয়তো জলজলে চোখ মেলে তাকাতে হয়েছে কারুর দিকে, তাতেই কাজ হয়েছে। তীব্র চাহনির তীক্ষ্ণতায় এফোঁড় ওফোঁড় হতে হতে বুঝতে পেরেছে সে—এ আদেশ ফেরার নয়।

গত কুড়ি বছর ধরে এ চাহনি, কোটরগত চোখের এই গনগনে আগুন তারা দেখে আসছে—বিপদে, সম্পদে, রাজদ্বারে, শ্মশানে সর্বত্র এ চাহনিই রক্ষা করে আসছে তাদের। শুধু এ গ্রামের পাঁচশো ঘরকেই নয়, অমন কত গ্রামকে, কত ঘরকে।

অত কষ্টের সংগ্রহ করা সেই চাল বস্তায় বস্তায় তখনো পড়ে আছে এই আটচালায় অন্ধকারে। একটিমাত্র হ্যারিকেনের অপরিস্কার আলোয় মুখবাঁধা বস্তাগুলোকে মনে হচ্ছিল চাচার, যেন একপাল জানোয়ার আরামে শুয়ে আছে। ঐখানটায়, বস্তাগুলোয় ঠেস দিয়ে এতক্ষণ বসেছিল মাস্টারের দল। মাস্টার নিজে বসেছিল অবশ্য চাচাব সামনে, উত্তেজিত স্বরে বলছিল, যুক্তি সাজাচ্ছিল। আর চাচা জড়বৎ স্থাণু, খুব কচিৎ একটি দুটি মোক্ষম কথা ছাড়া প্রায় নির্বাক। কথা বলার লোক ছিল কানাই আর মুস্তাক। কেননা কানাই, চাচার ডান হাত যদিও, সে অপরপক্ষে মাস্টারের নিজের ভাইপো। মুস্তাক বামহাত। এই শিরোপাগুলো চাচাই অবশ্য দিয়েছিল ওদের। সবাই তাই-ই জানতো।

সুতরাং মাস্টার একই কথা বলছিল বারবার। শালা জিনিষ-পত্তোরের দাম যেন পারলে আকাশ ছোঁয়—আর বাবুরা, কারখানায় চেয়ার নাড়ে আর মাইনা বাড়ায়—মরি শালা আমরা।' অমনি চালের বস্তায় ঠেস দেওয়া বুড়ো বদ্যিনাথ পো ধরে, শহরের লোকরা আমাদের মানুষই ভাবে না, বুইলে মাষ্টর—

রিসকা থেকে ঘর দুয়ারে নেমে বলে, আট আনা লিবি—চার আনা লিবি—যেন মাগনী।' বঙ্কিনাথের ছেলে রিক্সা চালায় শহরে।

মাস্টার কখনো সখনো যোগাড় করে পুরোন খবরেব কাগজ পড়ে। রুরাল ডেভেলপমেণ্ট স্কীমে একবার গভর্ণমেণ্ট থেকে ইস্কুলে ইস্কুলে লোক্যাল সেট ট্রানজিষ্টব দেওয়া হয়েছিল। ইস্কুলে থাকলে বারোভূতের হাতে কেন নষ্ট হয় জিনিষটা, তাই মাষ্টার সেটিকে নিজের বাড়ীতে যত্নে বেখেছে। ব্যাটারি থাকলে খুব আস্তে কানেব কাছে নিয়ে এসে সকাল সন্ধ্যে খবরটুকু শোনে। সুতরাং দেশেব বর্তমান পবিস্থিতি সম্বন্ধে জ্ঞান তাব কম নয়। সে বলে, 'শুধু তাই নয় বঙ্কিনাথ, শহরে যাও শালা গাড়িবে—ঘোডাবে—আলোবে, কোটি কোটি টাকা উডচে, আব আমাদের ন'মাসে ছ মাসে চাট্টি বিলিপেব গম—তাও কখনো আছে, কখনো নাই।'

এসব অভিযোগ কারুরই অজানা নয়—না কানাই এব—না মুস্তাকের—না চাচাব। কানাই আর্টস-এব গ্রাজুয়েট, বেকাব, সুতরাং প্রচুব বই পড়ে। সে সাবধানে তত্ত্বব কাঁকর বেছে বেছে সোজা কথায় দাম বাড়বার কারণ সকলকে বোঝাতে চেষ্টা করে, এমন সব হিসেব দেয় গত কয়েক বছরে দাম বাড়ার এবং বেতন না বাড়াব। শহবেব সব লোকদেব তার সঙ্গে জড়ানো যে কতখানি ভুল, তাব এমন চুলচেরা কারণ দেখিয়ে দিল যে, মাষ্টার কোণঠাসা হতে হতেও একবাব ভাবল, কানাই তো লেখাপড়ায় ববাববই ভালো ছিল, কি করে এই লোকটার সঙ্গে জুটল।

মুস্তাক বাপেব মত কম কথা বলা মানুষ। তাব ফর্সা মুখে সদ্যওঠা গোঁফের জন্য তাকে আরও গম্ভীর লাগে বয়সেব তুলনায়। সে মনে করিয়ে দেয় ঠিক করে, 'কিন্তু এই আন্দোলনটাতো আদৌ বেতন বাড়াবার ব্যাপার নয়—বিনা কাবণে ছাঁটাই কববে এটাই কি মানতে বলেন আপনি?'

মুস্তাক বয়সে সকলের ছোট, তবু তাব গলার মধ্যে এমন একটা ঝমঝম ভাব আছে যে হাজার গলার ভেতর থেকে আলাদা করা যায়। আলোচনাটা তৎক্ষণাৎ অন্যদিকে মোড নেয়। মাষ্টার সামান্য থতমত খায়। বুকের লোমে হাত বুলোয়। তারপব বলে, 'আমাদের কাছে ঐ একই ব্যাপার! যাঁহা চালভাজা তাঁহা মুড়ি। আমরা মরে গেলে ওরা দেখতে আসে? তবে ' তারপর বঙ্কিনাথের দিকে তাকিয়ে, মার ঝাঁটা ইসব আন্দোলন ফান্দোলনের মুখে, না কি বল বঙ্কিনাথ?

বঙ্কিনাথ সায় দেয়। উপস্থিত সবাই যেন মজা পায় কথাটায় এমনভাবে ঘাড় নাড়ে। হঠাৎ একটা অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে। পাথরের মূর্তিতে প্রাণ আসার মত গভীর গলায় চাচা বলে ওঠে, 'চার পাঁচ বছরের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলে মাস্টার!' প্রতিটি শব্দ কাটা কাটা—পাথরের মত ভারী। সে পাথরের আঘাতে ইতিহাস জেগে ওঠে। মুস্তাক, কানাই, রফিক, মাস্টার এমনকি বঙ্কিনাথ তক উঠে বসেছে তার ঠেস ছেড়ে কিছু শোনার আশায়। কিন্তু না— ঢেউ একবার উঠেই থেমে গেছে। ঐ রকমই। এ নীরবতা চাচার ব্রত নয়, ভাঙতেও বাধা নেই কিন্তু যারা তাকে জানে তারা এও জানে চাচা এই রকমই। ভিতরে ভিতরে যখন এক কঠিন সংকল্প ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে থাকে, ওপরটা তখন তার দুধের সরের মত শক্ত হয়ে যায়—ভিতরের তাপকে সে রক্ষা করে যেনবা। কিন্তু ঐ একটি কথাই সব। তারের গিঁটে গিঁটে সঠিক হাত লাগাবার মত ততক্ষণে জাগিয়ে দিয়েছে সে পাঁচ বছরের আগেকার ইতিহাস সকলের মনে। রফিক বলে ওঠে, 'উঃ, সি একটা সময় গেল গো—উঃ, সি একটা…' মাস্টারের চাউনিতে তার কথা মাঝখানেই থেমে পড়ে। মাস্টার তার কথার খেই ধরে নিপুণ হাতে, 'হ্যাঁ, সময়! সহর থেকে চারটে লোক এল, উস্কে দিয়ে তারপর কেটে পড়ল কোনদিকে কে জানে। তার নাম সাহায্য! বললেই হোল আর কি অমনি! যত্ত সব‥'। মুস্তাকের গলা আবার ঝমঝমিয়ে ওঠে, 'আমাদের সঙ্গে বেনামী জমি দখল করতে এসে গুলি খেয়েছিল বলে, কারখানায় এখনো চারজনা লোক ঢুকতে পারেনি মাস্টারবাবু।'

লোকজনের মধ্যে কেমন একটা গুঞ্জন ওঠে। পাঁচ বছর আগে এইসব গ্রামে যখন বেনামী জমি দখল আন্দোলনের হিড়িক চলছিল, তখন শহর থেকে অনেকে এসে দিনের পর দিন ছিল এইসব গ্রামগুলোতে। তারা সকলকে বুদ্ধি দিয়েছে, বলভরসা দিয়েছে, ধরে নিয়ে গেলে ছুটোছুটি করেছে জামিন আনতে —কারখানার লোকজনদের থেকে চাঁদা চেয়ে এনে মোকদ্দমা চালিয়েছে। আর তারই ফলে কয়েকশত বিঘা জমি তারা পেয়েছিল সেবার। শুধু তাই নয়, গাঁয়ে এখন 'ছোটলোকের' খাতির বেড়েছে—ভাগচাষীরা ঠিকঠিক ভাগ পেয়ে যাচ্ছে ধানের। মাস্টার 'ছোটোলোক' নয়,—জমি জিরেতের ব্যাপারে সে ছিল না, কিন্তু তার দলের অনেকে ছিল। একজন তো বলেই ফেলল, 'হঁ, তা যাকে বলে কিনা, শহরের বাবুরা আমাদের লেগে ঢের করেছে বটেক।'

সুতরাং মাস্টার যথার্থ চিন্তিত হয়। তার কপালে বড় বড় রেখা আকর্ণ প্রকটিত হয়ে ওঠে। আর অমনি চাচার বুক থেকে হুস করে একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে আটচালার গুমোট বাতাসে মিশে যায়।

চাচাকে সমস্ত জিনিষটা আবার নতুন করে ভাবতে হয়—ঢেলে সাজাতে হয় সমস্ত পরিকল্পনাটা। মাষ্টার তার প্রতিপক্ষ নয়, বরং বহুকাজে এযাবৎ তার মূল্যবান সাহায্য পাওয়া গিয়েছে। সে নিজে ধনী নয়—ধনীদের সে পছন্দ করে না, তাবলে বাউরী বাগ্দী জোলাদের সঙ্গে একপাতে বসতেও সে নারাজ। শহুরে বাবুদের উপর সে চিরকেলে চটা। শহরে তাকে যেতে হয় মাঝেমাঝে বেতনের বিল দিতে। প্রতিবার ফিরে আসে সে থুতু ফেলতে ফেলতে। বলে, 'শহরের লোকগুলান সব চামার হে—চামার। টাকা ছাড়া আর কিছু বুঝে না।' চাচা জানে বিল বার করার জন্য মাষ্টারকে ঘুষ দিতে হয়। কৈশোরে পড়াশুনা বাবদ কিছুদিন মাষ্টারকে শহরে কাটাতে হয়েছিল। তখনকার বহু তিক্ত স্মৃতি তার ভাণ্ডারে জমা আছে। মাঝে মাঝে রঙ্গ করে এখনো বলে সেসব।

আজ সারাদিন মাষ্টার বাড়ী ছিল না। চাল আদায় বা অন্য কিছু তাই জানতে পারেনি সে। সন্ধ্যায় ফিরতেই যখন তার কানে খবরটা তুলল বদ্যিনাথ, এবং বেশ ফুলিয়ে ফাঁপিয়েই, তখন রাগে একেবারে জ্বলে গিয়েছিল সে। দলবল নিয়ে যখন সে আটচালায় এসে পৌছল তখন সে উন্মত্ত ষাঁড় যেনবা। শহরের লোকদের উপর অখুশীর সংখ্যা কম নয়। কারখানা শহরটার কাছেই। সেখানকার কাঁচা টাকার গন্ধ পায় সবাই কিন্তু স্বাদ পায় না। উপরন্তু কাঁচা টাকার দৌলতে শহরটা চার পাশের গাঁ গেরাম থেকে শুষে নেয় যত দুধ, যত মাছ, যত ডিম—সব ভালোমন্দ। অনেকেরই তাই রাগ।

চাচা যে এসব জানেনা তা নয—আরো অনেক বেশী জানে। গর্ত্ত খুঁড়তে খুঁড়তে একেবারে কারণের গোড়ায় পৌছতে পারে সে। মাস্টার সুস্থির থাকলে, ঠাণ্ডা মাথায় এসে বসলে, দু'চারদিন সময় পেলে হয়তো সব ঠিক হয়ে যেত। কিন্তু হোল একেবারে উল্টো। মাষ্টার যত কোণঠাসা হয়, তত তার রাগ বাড়ে। আর রাগ একবার বাড়তে শুরু করলে বাণের জলের মত যুক্তির লগিতে তার তল পাওয়া মুস্কিল। সুতরাং মাস্টার উঠে যাবার পর থেকে চাচার চিন্তার যেন আর শেষ নেই।

এদিকে ক্রমে ক্রমে রাত বাড়ে। পেঁচার চীৎকার গভীর হয়। একটি দুটি করে মানুষজন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। গুমোট গরম কেটে ঠাণ্ডা বাতাস ভেসে আসে অল্প অল্প। চাচা হাতের ইশারায় সকলকে চলে যেতে বলতেই, কানাই আর মুস্তাক ছাড়া সকলেই চলে যায়। আসন ছেড়ে উঠে চাচা পায়চারী করতে থাকে।

।। দুই ।।

পলাশবনের মাঝখান দিয়ে গাড়ি চলছিল। গাড়ীব পিছনে চাচা বসে। দু'পাশে কানাই আর মুস্তাক হাঁটছিল। গাড়োয়ান তাড়া দিচ্ছিল গরুগুলোকে, তবু এবড়োখেবড়ো জঙ্গুলে বাস্তায়, দেখে মনে হচ্ছিল, ঘণ্টায় পাঁচপো যেতেই প্রাণান্ত হবে। কানাই আর মুস্তাক চেঁচিয়ে কথা বলছিল—যেন গাড়ীতে চালের বস্তা ডিঙিয়ে কথা ছুঁড়ে দিচ্ছিল এ ওর দিকে। লোহার হাল বাসানো চাকা লিক থেকে সবে গেলে অমনি আওয়াজ উঠেছিল—'হাঁ-কট্-কট্-কট্'। কানাই হুঁসিয়ারি দিয়ে বলে, 'গাড়িখান ভেঙে ফেলনা গো সুবলদা—আমাব কাকা অবিশ্যি তোমাকে দু হাত তুলে আশীর্বাদ করবে তা হলে।' সুবল দু হাতে গরুদুটোর ন্যাজ ম'লে দিয়ে তালুতে জিভ ঠেকিয়ে ট্-ট্-ট্-ট্ আওয়াজ কবে, বলে, 'শিশু মানুষেব খাবাব বাবু ইতে—ভগমান আছেন না,' সে দু'হাত জোড করে কপালে নমস্কাবেব ভঙ্গিতে ঠেকায়, বলে, 'কথায় বলে না, শিশুই তো ভগমান।'

—'দিন দু'য়েকেব মধ্যে কাকাব বাগ পড়ে যাবে বলে মনে হয়—না নান্তু—জিজ্ঞেস কবে কানাই। মুস্তাকেব ডাক নাম নান্তু।

—'মনে হয় না', মুস্তাক স্থিব কণ্ঠে উত্তর দেয়।

চাচার চোখ চারপাশে ঘোরফেরা করছিল। ঘসা কাঁচের মত সামান্য জ্যোৎস্না—এত সামান্য যে প্রায় ছায়া পড়ে না। পলাশ, কুরচি আর এথা সেথা কাশ ঝোপ। ঠাণ্ডা ফুরফুরে হাওয়া। ঝুপঝাপ শিয়াল এঝোপ থেকে বেরিয়ে ও ঝোপে চলে যায়। দূরে কোথায়, বোধ হয় হাওয়ার দিক পরিবর্তন হেতু ডেকে ওঠে মুরগী। আর খানিকটা গেলে নদীর পাড়ের উঁচু উঁচু গাছপালা নজর হবে। চাচা ক্রমশঃ বিস্মিত হচ্ছিল। এ রকমটা না হবারই কথা। কারণ মাষ্টারকে তার কুড়ি বছরের আঁতিপাঁতি চেনা। গাঁয়ের মানুষের প্রতি টানটা তার মেকি নয়, কখনো কখনো এর বাড়াবাড়িটা চোখে লাগে। কিন্তু এই

বাড়াবাড়িটা তার রক্তে আছে—শৈশব, যৌবন পার হয়ে, এই প্রৌঢ়ত্বের সীমায়ও সে তাকে ধরে রেখেছে তান্ত্রিকের শ্মশান চিয়ানোর মত। তাই এর যে উল্টো আর একটা দিক আছে—আজ যে এটা তাদের হাতের সামনে, এ কত বড় সুযোগ এটা কিছুতেই বুঝবে না সে। অবশ্য তার অভিমানটা যে খুব মিথ্যে, তেমন বলার মত জোরও নেই—এ সম্বন্ধে তার বক্তব্য যথাস্থানে বলে চাচা। কিন্তু সেটার জন্য আজ এই মুহূর্তে পাঁচশো শিশুকে অনাহার আর মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিলে পরে কি করে আব এ মুখ দেখাবে চাচা।

তবু খানিকটা সময় হাতে পাওয়া গেলে কী হোত কিছুই বলা যায় না—হয়তো মাস্টারকে বোঝানো যেত—খুব শক্ত ব্যাপারটা তবুও—কিন্তু···। কিন্তু আর চব্বিশটা ঘণ্টাও হারাবার ভরসা নেই চাচার। সে ঝুঁকি নেওয়াটাও ঠিক হবে না। বরং মাস্টারের ঝুঁকিটাই তাই নিতে হোল তাকে। কিছুই বলা যায় না। এ ধরণের মানুষ, সারাজীবন মানুষ নিয়েই কারবার চাচার। অনেক দেখেছে সে। এখন হয়ত ঝগড়া করবে দারুণ, লাঠালাঠিও করতে পারে। পরে, মাথা ঠাণ্ডা হলে, ভেতরেব কথাটা বুঝতে পারলে তখন এসে পিঠ চাপড়াবে। খানিকটা তাই প্রস্তুত হয়েই আসতে হয়েছে চাচাকে। মোটামুটি কানাই বা নান্ত ঘটনাটার আঁচ পেয়েছে বলেই তো মনে হয়। তবুও এতটা রাস্তা সুস্থিরে আসতে পারা গেছে এটা কম নয়। কারণ নদী আর অল্প দূর—তার পাড়ের বড় বড় গাছ এখন স্পষ্ট দৃশ্যমান। চাচা প্রাণভরে দেখে।

কিন্তু তারা ঠিক জায়গাটিতেই ছিল। ঠিক পাঁচজন। এবং প্রস্তুত। নদীর পাড় উঁচু শক্ত পাথুরে মাটির। এখন বৃষ্টি নেই, তাই ধুলোতে গাড়ীর চাকা একহাত ডুবে যায়। গাড়ীর চাকায় কেমন বিষণ্ণ ঘ্যাসঘোঁস শব্দ ওঠে। হামাগুড়ি দিতে দিতে গাড়ি পাড়ে উঠে বিশ্রামের আশায় এক লহমা থামে। তখন পাঁচজন সার দিয়ে দেওয়াল রচনা করে সামনে দাঁড়ায়। গাড়ীর ঠিক সামনে এখন গভীব খাদ এক ছুটে নেমে গেছে নদীর বুক অবধি। সেখানে এখন শুধুই বালি। মিটমিটে জ্যোৎস্নায় মনে হয় ছাই যেনবা। অনেক অফুরন্ত ছাই শুয়ে আছে। সুবল গাড়ির মুড়োয় বসেছিল—তার হাতের পাঁচন বাড়ি পড়ে যায় খসে। চাচা একলাফে ঝন্ করে নেমে এসে সামনে দাঁড়ায়।

'হট যাও সব—এইয়োঃ' হট যাও,' চাচা সুবলের হাতে খসে পড়া পাঁচন তুলে দেয়। দেওয়াল নড়ে না। খালি ময়লা জ্যোৎস্নায় মাস্টারের একপারি দাঁত ঝিকিয়ে ওঠে, চাপা গলায় গরগড়িয়ে ওঠে সে, 'আপনা গাঁয়ের লোককে

তুখা রেখে, নাংটো রেখে চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে চললে শালা প্রেম বিলোতে বাঃহ, বাঃহ···।' নিস্তব্ধ প্রান্তরে ওপারের পাড়ে প্রতিধ্বনি ওঠে আঃহ, আঃহ। চাচার দু'পাশে দু'জন—চাচার ডানহাত বাঁ হাত। কানাই, মাস্টারের সাক্ষাৎ ভাইপো ঝেঁকরে ওঠে, 'কাকা তুমি কি মানুষ লও গো—যাও সরে যাও—না হলে ভালো হবে না বলছি।'

ধীরে ধীরে চাচা সামনে এসে দাঁড়ায়, মাস্টারের হাত দুটো ধরে। সারা-দিনের সঞ্চিত কথা তার বুকে ফুট ফুট করে। কিন্তু অতি সাবধানে, গলায় লোহার শানানো পাত যেনবা, বলে, 'পাগলামি কোরনা ভাই—যাও এখন, দেখছ না সময় নেই—যা-আ-ও।' কিন্তু মাস্টার কিছুই দ্যাখে না কিছুই শোনে না। বরং পাঁচজনের দেওয়াল আরো ঘন হয়। চাচা দেখে মাস্টার সুবলকে হিঁচড়ে নামিয়ে দেয়, তারপর নিজে উঠে বসে গাড়ির মুড়োয়, 'হৈঃ—ট্যাক্-ট্যাক্, চঃ চঃ—কই হে যুঁয়ালটা ধরে ঘুবাও না, শালা ঘরের অন্ন ঘরে যাক।' মাস্টারের গলার স্বর ভালো কাজ করার উত্তেজনার মত কাঁপছে। পাঁচজনের চারজন তড়িঘড়ি হাত লাগায়। গরুগুলো কি করবে বুঝতে না পেরে খুঁট নিয়ে থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। আগুপিছু করে। যোয়ালের ঘষা লেগে চামড়ার আর দড়িতে ক্যাঁকোচম্যাকোচ শব্দ ওঠে।

চাচার সারা দেহে রক্ত দ্রুত ছুটতে থাকে। সে নিজেই বুঝতে পারে, ধরতে পারে পরিবর্তনটা। বুকের ভেতর অনেক বছর আগেকার ইংরেজ-মারা খুনেটা জেগে উঠতে চায়—কষ্টে তাকে দমন করতে হয়। কানাই আর মুস্তাক গাড়ির দুই চাকা ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, দুই দুই চার হাতে গাড়ির গতি রোখে। মাস্টার এই সময় দুই গরুকে তার হস্তধৃত পাঁচন বাড়ির স্বাদ দেয়—এত জোর ঘা পড়ে যে পাঁচনটা কড়মড় করে ওঠে—আর গরু দুটা—দুই অবোলা পশু প্রচণ্ড জোরে একটা মোচড় নেয়। সারা গাড়ির সারা অঙ্গ দুলে ওঠে। এত জোরে জোরে কথা হয় যে সারা মাঠটা ভেসে যায়। পাঁচখানা গলার সঙ্গে সমানে চেঁচায় কানাই। সব মিলে ছ'খানা হয়। সরু মোটা গলা মিলে মিশে একটা গোলমালের তালগোল তৈরী হয়। হঠাৎ গাড়ি সবশুদ্ধ পিছনে গড়াতে থাকে।

ছ'খানার সঙ্গে তারপর আর একখানা গলা মেলায় মুস্তাক। ফিনকি দেওয়া ঝমঝমে গলা—' বা'জান—গাড়ি রুকি দি?' গাড়ী গড়াতে থাকে। ভরাই দেওয়া গাড়ি—পিছনে টান খায়—গরুগুলো প্রচণ্ড চেষ্টায় সামনে খুঁট

দেয়—পারে না, তাদের পা লট্‌পট্‌ করে।

গাড়ির গতি বাড়ে। 'বা'জান···গাড়ি···,' আবার চীৎকার করে ওঠে মুস্তাক। গাড়ীর চাকা চলে গেছে তার একটা পায়ের ওপর দিয়ে। চাচা তাকে সম্মতি জানায়—'দে-দে···বাপ।' অথচ গাড়ী প্রচণ্ড গতিতে পিছনে গড়ায়। পাঁচজনের চারজন ততক্ষণে পুলকে ছিটিয়ে পড়ছে—মাস্টার গরুগুলোকে বেদম পিটোয়, আর গরুগুলো কখনো ডাইনে, কখনো বাঁয়ে হাঁকু-পাঁকু করে—তাতে মাস্টার আরো বেশী টাল খায়—কোথায় যাচ্ছে কিছুই সে বুঝতে পারে না। ভয়ে তার মুখ দিয়ে ফেনা ওঠে। তার হাতে পা পেট যেন শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চায় এত জোর নড়ে। ব্যতিব্যস্ত সে হঠাৎ কাৎরে ওঠে, হেই শালা পটলা—গাড়ি রুকে দে· '। কোথায় পটলা! মুস্তাকেব আর একটা পায়ের ওপর গাড়ীর চাকা উঠে পড়ে। সে আবার চিৎকার করে ওঠে, 'বাজান···'! চাচা উত্তর দেয়, '···রুকে দে'। গাড়ি প্রচণ্ড গতিতে গড়াতে গডাতে নিচের সমতল স্পর্শ করামাত্র একটা বিকটা হেঁচকি তুলে উল্টে যায়।

॥ তিন ॥

বেগতিক বুঝতেই পাচজনের চারজন তৎক্ষণাৎ হাওয়া। মাস্টারকে নিয়ে গাড়িটা সজোরে আ২ড়ে পড়েছিল মুস্তাকের উপর। চারপাশে ছাড়িয়ে পড়েছিল চালের বস্তাগুলো। কানাই অন্যপাশে ছিল—গাড়িটা উল্টে যাচ্ছে দেখে প্রাণপণে একটা চাকা টেনে ধরে তার উল্টানো রোধ করার চেষ্টা করছিল সে। পারেনি। মাঝখান থেকে থুতনিতে লেগেছে তার প্রচণ্ড চোট। গরু দুটোর গলার দড়ি খুলে যাওয়ায় ভয়ে সেগুলো কোথায় দৌড় দিয়েছে, কাছাকাছি কোথাও তাদের খোঁজ পাওয়া গেল না। সুবলকে নিয়ে কানাই আর চাচা গাড়িটা কোন রকমে খাড়া করে তুলল আবার। চালের বস্তার তলা থেকে যখন মুস্তাককে বার করা হোল, তখন তার অবস্থা গুরুতর, নাকমুখ দিয়ে রক্ত পড়ছে। সদ্যওঠা গোঁফের গোড়ায় রক্ত জমে চটচটে হয়ে আছে। অজ্ঞান। খানিক দূরে ছিটকে পড়ে থাকা মাস্টার গোঙাচ্ছে যন্ত্রণায়। তার হাতের হাড় ভেঙ্গে গেছে বোধ হয়।

কিন্তু ততক্ষণে বাতাস আরো ঠাণ্ডা হয়—ক্রমশঃ কাছিয়ে আসা ভোরের জানান দেয়। জ্যোৎস্না আরো তকতকে হয়ে আসে। সুতরাং দুটি আহত ক্ষত-বিক্ষত দেহ পাশাপাশি শুইয়ে রেখে গাড়িতে আবার বস্তা ভরাইএর কাজ চলে। কানাই এর চোট তবু কম। সে সাহায্য করে। পলাতক গরুদের খোঁজায় সময় ব্যয় না করে, কানাই একদিকে আর সুবল একদিকে ধরে যোয়াল। তারপর পাঁচশো শিশুর খাদ্য এগিয়ে চলে ধীরেসুস্থে তাল রেখে, নিঃশব্দে।

চাচা থেকে যায় দুটি আহত শরীরের ভার নিয়ে—কতক্ষণে ভোর হয়, লোকজন চলাচল শুরু হয় সেই আশায়। নদীর পাড়ের চড়াইটা ওঠে, তারপর গাড়ি সাবধানে উৎরাই বেয়ে নদীগর্ভে নামতে থাকে এবং একটু পরেই চোখের আড়াল হয়ে যায়।

চাচা ছুটে আসে। প্রথমেই মাস্টারের পাশে বসে। তার হাত সোজা করে দেয়। মাস্টার যন্ত্রণায় কাৎরে উঠতে উঠতে উঠতে বলে, 'আমি ঠিক আছি, যাও যাও, আগে নান্তুকে দেখ।' চাচা একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে তার সহকর্মী, তার একটু আগেকার শত্রু, বর্তমানে অনুতপ্ত, মাস্টারের দিকে। একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ে, তারপর উঠে এসে মুস্তাকের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে। পরণের কাপড় দিয়ে আস্তে আস্তে তার নাকমুখের রক্ত মুছে দিতে থাকে। তার মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে ডাকে, 'নান্তু—বাবা সোণা মাণিক আমার।' ভোরের বাতাস বেশ শীতল হয়। চারপাশে গাছপাতায়, নীরব শব্দের স্রোত বয়ে যায়। চাচা আবার ডাকে—'নান্তু—আমার নান্তু সোণা।' তার হাত আদরের ভঙ্গিতে মুস্তাকের বাহুমূলে চলাফেরা করে।

মুস্তাক হঠাৎ বিকারের ঘোরে পাঁচশো শিশুর মত গলায় ঝমঝমিয়ে উঠে 'বা'জান—গাড়ি রুকি দি…।' []

দেবতোষ শেষ পর্যন্ত কিছুই হয়নি।

অথচ জ্যেষ্ঠতাত থেকে কনিষ্ঠ মাতুল সকলের উচ্চাশার সিঁড়িটা উঁচু ছিল আকাশ অবধি। কিন্তু দেবতোষ, যার পা দুটি আশানুরূপ পুষ্ট ছিলনা, টপকাতে পারল না সেটা। ফলতঃ, দেবতোষ অঙ্কের বাঁদরের মত পদে পদে হড়কাতে হড়কাতে, দিনে যতটুকু ওঠে রাতে ততটুকু নেমে, যেখান থেকে শুরু করেছিল সেখানেই রয়ে গেল।

মোটামুটি এইটুকুই দেবতোষের ইতিহাস। অবশ্য ঘটনাটা সম্পর্কে সকলেরই নিজের নিজের বিশ্লেষণ ছিল, এবং নিজের মতটাই যে সবচেয়ে সঠিক—এই ধারণাটা ছাড়তে কেউ রাজি ছিল না।

ধরুন দেবতোষ। তার চারপাশে বিশ্বাসের চারাগাছগুলি তাকে ফিসফিসিয়ে অন্য কথা শোনাত। পৃথিবীর আকাশে যে ক'টা দুষ্টগ্রহ নির্লজ্জের মত হরদম ঘুরপাক খাচ্ছে, তারা যে সবাই তার জন্মকুণ্ডলীতে ঢুকে পড়ে ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মত গুঁতোগুঁতি করছে, এই বিশ্বাসটা দেবতোষের কাছে সন্দেহাতীতভাবে সত্য ছিল।

ধরুন, দেবতোষের জ্যাঠামশাই। তিনি কিছুদিন আগেও স্বপ্ন দেখতেন, দেবতোষ রকফেলার এ্যাণ্ড কোম্পানীকে ১০,০০,০০০ লাখ টাকার চেক কাটছে। এখনো হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেলে মনে মনে নীলচে আলোয় চকচকে সাদা টেলিফোনে ২০০ মাইল দূরবর্তী দেবতোষকে ট্রাঙ্ক করেন। আবার এই জ্যাঠামশাই সকালে যখন তালিমারা লুঙ্গি আর ঠনঠনের চটি পায়ে প্রাতঃভ্রমণে বার হন, তখন তাঁর বাঁ হাতে থাকে একটি শীর্ণ থলি, ফতুয়ার পকেটে একটি দোমড়ানো এক টাকার নোট আর একটি চকচকে আধুলি। গঙ্গা থেকে উঠে আসা সরু সরু বাতাস বেশী ব্যতিব্যস্ত করলে একটা কাল্পনিক গ্রেটকোট চড়িয়ে নিয়ে তড়বড়ে পা ফেলে হাঁটতে থাকেন তিনি। চকচকে ইলিশের পাশ ঘেঁসে যাবার সময় যদি কোন দীর্ঘনিঃশ্বাস কখনো ওঠে সেটাকে কষ্টে চেপে রাখতে হয় তাঁকে। কেননা যতক্ষণ সেই বিশীর্ণ নোট ও উদ্ধত আধুলি আদের সান্নিধ্যে তাঁকে জারিত করে; ইলিশমাছের প্রতি একটা ঠোঁট-ওল্টানো

অবজ্ঞা দীর্ঘনিঃশ্বাসের প্রতিষেধক হিসাবে কাজ করে। এমন যে জ্যাঠামশাই, তিনি বলেন—এ জগতে মামার অভাবে কত প্রতিভা যে নষ্ট হয়—যেমন আমাদের দেবু…।

দেবতোষের বাবা এখনো মাঝে মাঝে আত্মবিস্মৃত হয়ে যান ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেবতোষের হাতের লেখার সাদৃশ্য দেখে। প্রতিটি টান, টানের মারপ্যাঁচ, প্রতিটি গোল এবং প্রতিটি চৌকা কি করে এমন অখণ্ড ঐকতান রক্ষা করে ভেবে অবাক হন তিনি। একদিন একটা সই-করা কাগজ লুকিয়ে এনেছিলেন বাড়িতে। কিন্তু খেয়াল ছিল না তাঁর যে সময়টা মাসের শেষ। সুতরাং দেবতোষের মা, সেই একমাত্র দেবতোষত্বে অবিশ্বাসকারিণী মহিলা তাঁকে খুশীর হাসির পরিবর্তে ভর্ৎসনার জ্বালা উপহার দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ছেলেটাকে মাটী কোরনা এমন করে।

দেবতোষের ফুল-সাইজের ছবি টাঙানো আছে ছোট মামার শোবার ঘরে। অবশ্য ঘর ঐ একটাই—পঞ্চাশ টাকা ভাড়ায় এর বেশী হয়না বলেই। তবু ছোটমামা এটাকে বেডরুম বলতে ভালোবাসেন। দৃশ্যপট বদল হলে, অর্থাৎ বেডরুম ব্যাঙ্কোয়েট হলে রূপান্তরিত হলেও তাঁর বিরক্তি প্রকাশ ছাড়া করণীয় কিছুই থাকেনা। তবু তিনি সযত্নে রক্ষা করেন দেবতোষের ছবি। আটাশ ইঞ্চি ছাতি ফুলিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে দৃপ্ত ভঙ্গিতে ব্যাট হাতে কোন অনাগত অদৃশ্য বলের গতিপথের দিকে তাকিয়ে। অবশ্য কোন বল কখনো সেই ছবির দেবতোষের ব্যাটে ধরা দিতে আসেনি। কিন্তু এ খবরটা মামা নিজের কাছে ছাড়া সর্বত্র অস্বীকার করতে ভালোবাসেন। তাঁর মতে, পলিটিক্স করে সবাই দেবুকে উঠতে দিলনা।

যাই হোক দেবতোষ কারুর আশা পূর্ণ করেনি। কিন্তু এঁদের সকলের আরোপিত দেবতোষ, সত্যিকারের দেবতোষের আটাশ ইঞ্চি বুকের খাঁচায় লালিত হয়েছিল ধীরে ধীরে মাদক অভ্যাসের মত। দেবতোষের হাত, পা, আঙুল, নখ, দাঁত সব কিছু তাই গড়ে উঠল সত্যিকারের দেবতোষের আদলে, কিন্তু তার চোখের চঞ্চল দৃষ্টি যেন পৃথিবীর সব কিছুকেই বাউণ্ডারী হাঁকড়াতে চাইত। তার কানে সবসময় গুরু গুরু করত পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগামী জেট্ প্লেনের আওয়াজ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান আর সত্যিকারের শ্রেষ্ঠত্বের মধ্যে যে পার্থক্যটা আছে সেটা বোধহয় কেউ তাকে কখনো বুঝিয়ে দেয়নি। সে নিজেও এটা কোনদিন বুঝল না। ফলে হোস্টেলের প্রাণচঞ্চল পরিবেশেও সে ছিল সবচেয়ে নিঃসঙ্গ। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি প্রস্পেক্টাস্

আর তাদের পোষ্ট্যাল কোচিং-এর কাগজপত্র ছাড়া কেউ তার বন্ধু হোল না এতদিনেও। তার স্বপ্ন ঘুরপাক খেতো শুধু ভবিষ্যতের সম্ভাবনার আকাশ-কুসুমকে ঘিরে, কিন্তু বর্তমানের পিছল মাটিতে কেমন করে পা রাখতে হয় সেটা শিখতেই ছিল তার সবচেয়ে শৈথিল্য। আসানসোলের কাছাকাছি একটি মধ্যবিত্ত কারখানায় ফর্ক লিফ্ট চালাত সে। আর এই দশ হর্স-পাওয়ারের যন্ত্রটার উপরই তার ছিল সবচেয়ে বেশী ঘৃণা। যখন সে, সেই খাড়া ট্যাং-টেঙে চেয়ারটায় বসে ক্লাচ, গীয়ার, ব্রেক ইত্যাদিকে ব্যবহার করত, যন্ত্রটা একটা চাবুক-খাওয়া জাগুয়ারের মত গরগব করতে করতে একবার থমকে দাঁড়িয়ে হঠাৎ লাফ দিয়ে চলতে শুরু করত অত্যন্ত অবলীলায়, দেবতোষ গ্যাঁট হয়ে বসে থাকত মুখে একটা নির্বিকার ভঙ্গি ফুটিয়ে। তার হাব-ভাবে মনে হোত, যেন তার পায়ের তলার যন্ত্রটা একটা দশ এইচ. পি.র ফর্ক লিফট নয়—একটা লিমুসিন।

কিন্তু মুস্কিল হোত আশপাশের আর পাঁচজনকে নিয়ে। তারা ফর্ক-লিফট্‌কে ফর্ক-লিফট্ বলে। লিমুসিনকে বলে লিমুসিন। তারা দেবতোষের এনলার্জ করা ব্যাট-হাতে ছবিটা দেখে মুচকি হাসে, দেবতোষের হাঁটা-চলা দেখে হাসে। কথা শুনে হাসে। শুধু নাম শুনলেই হাসে। তারা দিনরাত মোটা মোটা বই পড়ার বদলে তাস খেলা পছন্দ করে এবং দেবতোষের মতে অশালীন হল্লা বলে মনে হলেও ছুটির দিনে প্রচণ্ড দাপাদাপি করে।

দেবতোষ ওদের অজ্ঞতা আর ছেলেমানুষিতে করুণা বোধ করত। চকচকে মলাটের বাঁধানো ডায়েরী ছিল একটা ওর। তাতে লিখত এসব কথা। ছোট ছোট ঘটনা, যাতে ওদের কেউ না কেউ, কখনো না কখনো একটা অজ্ঞতার পরিচয় দিত। আর এসব ঘটত রোজই। সুতরাং দেবতোষকে কখনো ডায়েরীর পাতা ফাঁকা রাখতে হয়নি।

হাবিব এসে তাকে ডাকে, 'দেবু তুই তাস খেলতে জানিস?'

দেবতোষ এমন ভঙ্গিতে তাকায় যেন প্রশ্নটার অকিঞ্চিতকরতায় সে ক্ষুব্ধ হয়েছে।

'খেলবি?'

দেবতোষ এবার মুখ খোলে, 'তাস খেলে কি হয়?'

এবার বিরক্ত হয় হাবিব। 'কি আবার হবে? তোর মত দিনরাত মুখ গুঁজে বসে থাকলে কি হয়?'

'মুখ গুঁজে বসে থাকি আমি! পড়াশুনা করাটা তোর কাছে মুখ গুঁজে

বসে থাকা? জীবনে উন্নতি করাটা এত সোজা নাকি? মাথায় কিছু আছে যে বুঝবি!'

রেগে ওঠে হাবিব। 'শালা যেখানে দাঁড়িয়ে আছিস সেখানে বাঁচাটাই মস্ত সমস্যা। উন্নতি করবি কি?'

চলে যেতে যেতে শুনতে পায় হাবিব দেবতোষের উপদেশ, 'পড়াশুনা কর ভালো করে। আমার মামা আছে স্টীল প্ল্যাণ্টের ম্যানেজার—ভালো পোস্টে ঢুকিয়ে দেব।'

দোলের দিনে দেবতোষ দরজা বন্ধ করে বসেছিল নিজের রুমে। পারলে বাড়ি চলে যেত, কিন্তু হাতে টাকা ছিল না। এসব কারখানাগুলো আবার দোলের দিন বন্ধ থাকে।

অরুণ এসেছিল দেবুকে ডাকতে। দরজায় ধাক্কা দেওয়া সত্ত্বেও দেবতোষ সিঁটিয়ে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসেছিল। কিন্তু হোস্টেলের পলকা দরজা-জানালায় ছিদ্রের অভাব নেই। অনবরত রঙ পিচকারিত হয়ে ঢুকতে লাগল ঘরে। আর দেবতোষ চিৎকার চেঁচামেচি করতে লাগল কলে চেপা ইঁদুরের মত। শেষে যখন রঙের বদলে ঘরে ঢুকতে লাগল কাদা, তখন মারমূর্তি ধরে বেরিয়ে এল সে। কিন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখতে পেল না কাউকে। দেবতোষ শূন্যে গালাগালির অস্ত্র আস্ফালন করতে লাগল বাইরে এসে। অমনি ছাদ থেকে একগাদা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ধরনের বাঁদুরে রঙ ঝরে পড়ল তার সর্বাঙ্গে। তার পোষাক এমন বিচ্ছিরি রকম নষ্ট হয়ে গেল যে ফেলে দেওয়া ছাড়া গতি রইল না।

পরে ব্যাপারটা রিপোর্ট করেছিল সে হোস্টেল সুপারিণ্টেণ্ডেন্টকে। তিনি হাসি চেপে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কার বিরুদ্ধে তোমার রিপোর্ট বল'। বলতে পারেনি সে। তখন কিছু উপদেশ শুনে ফিরে আসা ছাড়া উপায় ছিল না তার।

নিজের হিমালয়-প্রমাণ উচ্চতাটাকে দেবতোষ যে মাঝেমাঝে নুইয়ে আনতে চেষ্টা করত না তা নয়—পারতনা। কি উপলক্ষে মেসে একদিন ভালো খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা ছিল একটু। মুরগীর ঠ্যাং চুষতে চুষতে একজন বলল, 'দামোদরে হাজার হাজার বালিহাঁস এসেছে রে। দু'চারটে করে মেরে আনতে পারলে বেশ রোজই ফিস্ট করা যায়।'

'দূর, বালিহাঁসের মাংস বাজে!' মন্তব্য করে আর একজন।

তারপর রকম-বেরকম মাংসের কথা এল। এল তাদের হরেক রকম স্বাদ আর রন্ধনকৌশলের কথা। দেবতোষ হঠাৎ ফস্ করে বলে বসল, 'মাংসের কথা যদি বল, সে হোল দক্ষিণ আমেরিকার মেকিয়ানারা। খায় শুধু আঙুর। তার মাংস নাকি আঙুরের মতই নরম আর মনাক্কার মত মিষ্টি। আমার এক মামা থাকে...'।

কথা আর শেষ হোল না দেবতোষের। মুখ তুলে তাকাতেই দেখে সামনে পিছনে আশেপাশে সকলের মুখ গম্ভীর। তারপরই একটা হাসির ঢেউ গড়িয়ে যায় সারা টেবিলের উপর দিয়ে। দেবতোষ উঠে যায় মুখ কালো করে।

এত হাসি তার ভাল লাগে না। দেবতোষ তার চারপাশের মাটি ছাড়িয়ে ক্রমাগত শূন্যে উঠে ত্রিশঙ্কু হয়ে ঝুলতে থাকে চারপাশের উচ্ছ্বাস আর হাসির ঢেউ-এর মাঝখানে দেবতোষ পড়ে থাকে এক রুক্ষ প্রস্তরময় দ্বীপ হয়ে।

বরং অফিসার পাড়ার বাবলু বলে একটি ছেলের সঙ্গ তার কাছে অনেক গ্রহণীয় ছিল। বাবলু কলেজে যেত এবং পড়াশুনার ব্যাপার ছাড়া দুনিয়ার আর সমস্ত ব্যাপারে তার ছিল প্রচণ্ড জ্ঞান। বাবলুর বাবা কণ্ট্রাকটার। তাঁর মেদভারে বিপুল চেহারা আর মুখে-চুরুট প্রবল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি যখন ফিরতেন গাড়ি করে, দেবতোষ মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকত। দেবতোষ বাবলুর সমবয়সী, তবু বাবলুর মাকে দেখে কোনমতেই তার বড়দি-বয়সীর বেশী মনে হোত না। এদের পাশে নিজের বাবার ময়লা জীর্ণ গেঞ্জীর উপর ইস্ত্রী-করা-জামা-চাপানো রোগা চেহারাটা ভাবতে তার রাগ হয়—মায়ের গালের-হাড়-উঁচু-মুখের দু'পাশে চুপসানো চোখ দুটি মনে পড়লে তার লজ্জার আর সীমা থাকে না। যদিও বাবলুর বোনের 'ড্রাইভার-দা' সম্ভাষণটা তার কাছে অতীব কটু শোনায়, তবু এদের স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্যের প্রশংসা না করে সে পারে না। এদের সঙ্গে নিজের ভাগ্যের তুলনা করে সে প্রতিমুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হয়। যেন এই ক্ষোভের প্রতিকারের জন্যই বাবলুদের বাড়ি তার রোজ যেতে ইচ্ছে করে এবং সবুজ লনে চেয়ার পেতে সে একবার বসতে পেলে ওঠার আর নামটি করে না। কিন্তু দুটো আকাঙ্ক্ষা তার যতই প্রিয় হোক, সর্বদা তার সাধ্যে কুলায় না। কেননা চেয়ার পেতে বসা বাবলু পছন্দ করে না। দেবুর সঙ্গে বেড়াতেই বেশী ভালোবাসে সে, এবং বেড়াতে বেড়াতে নানারকম মুখরোচক গল্প বলে। গল্প শুনতে শুনতে দেবতোষ যখন তার জ্ঞানের বিশালতায় মুগ্ধ, তখন বাবলু রাস্তার পাশের এক রেস্তোঁরায় ঢুকে মালিকের সঙ্গে গল্প করে। দেবতোষ অর্ডার দেয় এবং দেখে, খাওয়ার পর, সম্ভবত ভুল করেই, বাবলু রাস্তায় বেরিয়ে

পায়চারি করে। ফলে পরের দিন সকালেও দেবতোষকে টিফিনের বদলে এই রেস্তোঁরায় বিভিন্ন সুখাদ্যের গন্ধ মনে মনে চিবানো ছাড়া উপায় থাকে না।

আর একটি গন্তব্যস্থল আছে তার, স্থানীয় কলেজের অধ্যাপক মুখুজ্যে মশায়ের বাড়ি। তিনি নিজে গরীব অবস্থা থেকে উঠেছিলেন বলে, দেবতোষের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে স্নেহের চোখে দেখতেন। টিউশানির ফাঁকে তাঁর দুর্লভ অবসরটুকু তিনি কখনো কখনো দেবতোষের জন্য ব্যয় করতে রাজী ছিলেন। কিন্তু তিনি যখন শুনলেন, স্কুল ফাইন্যালটাও পাশ করতে পারেনি দেবতোষ তখন তাঁর সেই আগেকার উৎসাহ আর রইল না। দেবু এলে তিনি শরীরের কুশল সংবাদ নিতেন, যত্ন করে টিফিন খাওয়াতেন। কিন্তু পড়াশুনার কথা উঠলেই বলতেন, 'আজ থাক।'

এমনিভাবেই কাটছিল দেবতোষের। কিন্তু গতমাসে কয়েকটি অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। দেবতোষের মা ইতিমধ্যে তিনটি চিঠি লিখেছেন, যাতে, শারীরিক কুশলাকাঙ্ক্ষার পর বেশ স্পষ্ট করে সংসারের অর্থনৈতিক সংকটের বর্ণনা এবং কিছু টাকা পাঠাবার অনুরোধ আছে। যদিও চিঠিগুলি লিখেছেন মা, কিন্তু প্রত্যেকটিতেই ঠিকানা ইংরাজীতে টাইপ করে দিয়েছেন বাবা। যার অর্থ বাবাও ঐ চিঠি দেখেছেন এবং সমর্থন করেছেন। বাবার কথা ভাবলেই দেবতোষের মনে পড়ে যায় তাঁর চাকরির মেয়াদ আর মোটে দু'বছর।

বাবা এ পর্যন্ত তাকে টাকার কথা কখনো খোলাখুলি বলেননি। কেননা তিনি উন্নতি চাইতেন, এবং বুঝতেন উন্নতি করার জন্য দেবতোষের কিছু বেশী টাকার প্রয়োজন। বাড়ি গেলে এখনো দেবতোষকে দেখাতেন সেই কাগজখানা যাতে ম্যাজিস্ট্রেটের সই দেবতোষের বলে মনে হোত।

কিন্তু দেবতোষ টাকা পাঠাতে পারেনি। কি একটা ব্যাপারে গতমাসে কারখানা বন্ধ থাকায় তার কয়েকদিনের বেতন কাটা গেছে। ব্যাঙ্ক থেকে তুলতে পারেনি, কারণ সেখানে তার কোন অ্যাকাউণ্ট নেই। ধার করতে পারেনি, কারণ সকলের অবস্থাই একরকম। তেমন বন্ধুও তার কেউ নেই। বন্ধের দিন ক'টায় দেবতোষের বই পড়া ছাড়া কোন কাজ ছিল না। হোস্টেলের ছেলেগুলো সারা দিনরাত কোথায় কোথায় যেন ঘুরত। খেতে আসত যখন রোদে ঘেমে মুখ কালো। দেবতোষকে নিয়ে তাদের সেই হাসাহাসিটা কয়েকদিন আদৌ শোনা যায়নি। কারণ সকলের মুখে সবসময়ই কেমন একটা মেঘ মেঘ গম্ভীরতা ঘিরে থাকত। দেবতোষ ডায়েরীতে লিখেছিল, 'এই

ছেলেগুলো মেতে ওঠার মত কোন একটা ব্যাপার পেলেই হোল। কি একটা ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা, কি একটা লে-অফ, লাফালাফি, অমনি শুরু হয়ে গেল। অবশ্য কি নিয়েই বা থাকবে এরা পুওব ফেলো!'

এই সময়টাতে দেবতোষ পড়ল অসুখে। পোস্টঅফিস থেকে ফিরছিল সে। প্রচণ্ড রোদের মধ্যে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। খবর পেয়ে হাবিব তাকে তুলে আনে। একে সকলের উৎকণ্ঠা, তার উপর সবারই পকেট খালি। তখন পবামর্শ হোল হাসপাতালে পাঠানোর। কথাটা কানে যেতেই হাত পা ছুঁড়তে লাগল সে। চিৎকার করতে লাগল, 'মেডিকেল কলেজের ডঃ বোস আমার কাকা, আর আমাকে কিনা তোদের এই পচা হাসপাতালে···।' বাধ্য হয়ে দেবুর বাড়িতে টেলিগ্রাম পাঠানো হোল।

পরের দিন এসে পৌঁছলেন সেই দেবতোষত্বে অবিশ্বাসিনী মহিলা—দেবতোষের মা। তিনি হোস্টেলের ছেলেদের কাছে সব শুনলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সকলকে ডাকতে লাগলেন নাম ধরে যেন কতদিনের চেনা। দেবুকে দেখে টেখে বললেন, 'বাবা অরুণ, দেবুকে তুমি হাসপাতালেই পাঠাবার ব্যবস্থা কর।' দেবতোষ করুণ চোখে পিট পিট করে তাকাতে লাগল মায়ের মুখের দিকে। অরুণ অপ্রস্তুত মুখে বলল, 'মেডিকেল কলেজেই না হয় নিয়ে যান—আমরা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।' মাসিমা চুপ করে রইলেন। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে মা-ছেলের চোখে চোখে যে শব্দহীন কথোপকথন হয়ে গেল তা কারুর চোখ এড়াল না।

হাসপাতালেই যেতে হোল দেবতোষকে। তারপর মেডিকেল কলেজ বা ডঃ বোসের উল্লেখ সে একবারও করতে পারেনি এবং এই না পারার অভিমানটা প্রকাশ করার জন্যই সম্ভবত সে একেবারে লক্ষ্মী ছেলে হয়ে যায়। ওষুধ খেতে সে আপত্তি করে না। হোস্টেলের বন্ধুদের কাছ থেকে উপহার আসা ফলমূল, দুধ সে বিনা দ্বিধায় গলাধঃকরণ করে। দলকে দল ছেলে আসে প্রতিদিন দেখতে। তাদের কথা আর হাসিতে দেবতোষ এখন এমন উজ্জ্বল হাসে যে মায়ের সঙ্গে যেন এ ব্যাপারে সে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। দেখে কে বলবে এ সেই এক সপ্তাহ আগেকার দেবতোষ!

দেবতোষ মনে মনে ভাবে, যে করে হোক বাঁচতে তো আমাকে হবে। তার বুকের মধ্যে আগের মতই স্বপ্নগুলি কিলবিল করে। বাবলুর বাবা তাকে নিজে বলেছেন, 'একটু এক্সপিরিয়েন্স বাড়ুক, তোমাকে আমার ফার্মে নিয়ে নেব।'

শুধু মায়ের সঙ্গে কথা বলা সে একেবারেই বন্ধ করেছে। মা চুপটি করে

পাশে বসে চুলে বিলি কাটতে কাটতে ডাকেন, 'দেবু—বাবা দেবু'। দেবুর চোখে তখন রাজ্যের ঘুম এসে বাসা বাঁধে। মায়ের চোখের কোলে জল চিকিয়ে উঠতে চায়, কষ্টে রোধ করেন। দীর্ঘশ্বাস চেপে বলেন, 'সত্যকে তুমি সত্য বলে চিনতে শেখো বাবা—নইলে শুধু অন্যকে কষ্ট দেওয়া হবে, নিজেও কষ্ট পাবে।'

হাবিব চুপি চুপি অরুণকে বলে, 'বাবলুর সঙ্গে সেদিন দেখা হয়েছিল। দেবুর অসুখ শুনে কি বলল জানিস ?'

'কি করে জানব !'

'বলল, এবার তবে একটা পোষ্ট খালি হবে মনে হচ্ছে। বাবাকে খবরটা জানাতে হবে।'

'শালা ভাগাড়ের শকুন !'

মাসিমা বললেন, 'আমি তবে এবার আসি বাবা অরুণ !'

'সেকি, দেবু হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার আগেই চলে যাবেন ?'

'সেখানেও তো একটি অসুস্থ লোকের উপর সংসার চাপিয়ে দিয়ে এসেছি। তাছাড়া—এখানে আমার তো আর তেমন প্রয়োজনও নেই।'

দেবুর বিছানার পাশে মাসিমার চোখের জল যারা দেখেছে তাদের কাছে এই 'তাছাড়া'র বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

মাসিমা কিছু ইতস্তত করে দু'হাতে হাবিব আর অরুণের হাত চেপে ধরেন। —'তোমাদের কাছে আমার কিছু ভিক্ষা চাওয়ার আছে বাবা।'

সসংকোচে হাত সরিয়ে নেয় ওরা। 'এমন করে কেন বলছেন মাসিমা !

'তোমরা দেবুকে ক্ষমা কোরো বাবা। আমি সবই জানি, তাই বলছি ওর অপরাধের কথা ভেবে ওকে যেন তোমরা ফেলে দিও না। তাহলে কোথাও আর ওর দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না'।

ওরা চুপ করে থাকে।

মাসিমা আবার বলেন, 'মানুষকে যে ভগবান একদিকে সবচেয়ে অসহায় করে গড়েছেন আবার সমাজ গড়ে দিয়ে অন্যদিকে এই অসহায়তারই প্রতিকার করেছেন, এই সত্যটা দেবু কোনদিন বুঝল না। তবে বুঝতে তাকে একদিন হবেই, শুধু ভয় হয় পাছে সেদিনটা খুব দেরী হয়ে যায় !'

হাবিব বলে, 'আপনি নিশ্চিন্তে যেতে পারেন মাসিমা। দেবুর কোন অযত্ন হবে না। আমাদের কারখানা এখন বন্ধ আছে—দিনরাত আমরা ওর

দেখাশুনা করব।'

'বন্ধ কেন?'

'ও কিছুনা। আমাদের কর্তাবাবু অমন মাঝে মাঝে ছুটি দেন আমাদের শরীর ভালো থাকবে বলে।' নিজের রসিকতায় নিজেই হাসতে গিয়ে মিইয়ে যায় হাবিব।

'আর অমনি দু'একজনকে একেবারে চিরকালের জন্য ছুটিও দিয়ে দেন পয়সাকড়ি মিটিয়ে'—যোগ করে অরুণ।

সাতদিন পর। দেবতোষ হাসপাতালের বিছানায় বসে একটি অঙ্ক নিয়ে আঁকিবুকি কাটছিল। হঠাৎ সামনে উস্কোখুস্কো অরুণকে দেখে একেবারে অবাক হয়ে যায়। এখন সে অনেকটা সুস্থ। হোস্টেলের ছেলেদের সে বারণ করে দিয়েছিল আসতে; তাছাড়া এই দুপুরে হসপিটাল ওয়ার্ডে আসা নিয়মও নয়।

অরুণ ব্যস্তভাবে বলে, 'তোর ছাড়া পেতে কত দেরী বলতো?'

দেবতোষের ভ্রু কুঞ্চনে বিরক্তি ফুটে ওঠে—'কেন?'

'যেভাবে পারিস আজকেই রিলিজ করিয়ে নিয়ে কাল কারখানায় চলে আয়। দশজনের ছাটাই লিস্ট বেরিয়ে গেছে—তার মধ্যে তুই একজন।'

'য়্যাঁ' যেন কথাটার মানে বুঝতে কিছু সময় লাগে তার। তার চোখের সামনে হাসপাতাল, অরুণ, স্বপ্ন সবকিছু ঝড়-লাগা বাতির মত দুলতে থাকে। শূন্যে মুঠি বাড়িয়ে শেষ চেষ্টার মত তোতলায় সে, 'একবার বাবলুকে যদি এসময়—' কথার মাঝখানে বাধা দেয় সে, লাভ নেই। সম্ভাব্য নতুন রিক্রুটদের মধ্যে সে একজন।

'ও', আর কিছু বলেনা দেবু। বলার কথা খুঁজে পায়না।

'আচ্ছা আমি চললাম,' বলে এগিয়ে যেতে গিয়ে অরুণ দেখে দেবতোষ শক্ত করে তার হাত ধরে আছে। তার চোখের সামনেই আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে দেবতোষ। পায়ে লেগে খাতা কলম মেঝেতে গড়িয়ে পড়ে যায়—লক্ষ্যও করেনা সে।

অরুণ বলে, 'ছাড়। এবার আমি যাব।'

দেবতোষ আকুল হয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলে, 'আমি বোধহয় হাঁটতে পারবনা, তুই আমাকে নিয়ে চল অরুণ।' []

শোক মিছিল

কমরেড সুবিমল আর একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন।

সেকেণ্ডের কাঁটা আর কয়েকটা পাক ঘুরে গেলেই ঘণ্টার কাঁটাটা দশের দাগ ছুঁয়ে ফেলবে। পরিকল্পনামত শোক মিছিলটা ঠিক তখনই, ঠিক দশটায় গর্জে ওঠার কথা। কিন্তু… …

সুবিমল কমরেড রঞ্জনের অসহায় মুখের দিকে তাকালেন। তিনিও তাকিয়েছিলেন ঘড়ির দিকেই। একটা ঘন ক্লান্তিকর নৈঃশব্দ ঘোরাফেরা করছে এই চারমাথার মোড়টায়।

সুবিমল মুখ খুললেন প্রথমে, আমার মনে হয় কিছু একটা গোলমাল হয়েছে।

রঞ্জন কিছু বলতে পেরে যেন বাঁচলেন, একটু এগিয়ে গেলে কেমন হয়?

রঞ্জনের স্বর কাঁপা-কাঁপা, শ্লেষ্মা জড়ানো। খানিকক্ষণ আগে পর্য্যন্ত কাঁদছিলেন, দুহাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। শহীদ কমরেড বিনায়ক তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ছিল। লোকে বলত রঞ্জনের "ডানহাত"। সুতরাং সেই বিনায়কের মৃত্যু রঞ্জনের কাছে কতবড় আঘাত তা বুঝতে কারুর কষ্ট হবার কথা নয়।

বস্তুত রঞ্জনের অনুমোদনেই এই শোকমিছিল, নয়তো অন্য নেতাদের এ ব্যাপারে আপত্তিই ছিল। প্রস্তাবটা এসেছিল যেহেতু সুবিমলদের ইউনিয়ন থেকে সুতরাং এঁরা যথারীতি ব্যাপারটার মধ্যে রাজনীতির গন্ধ পেয়েছিলেন। তবু কমরেড বিনায়কের মৃত্যু বলেই হয়তো, এবং রঞ্জনের পেড়াপেড়ির ফলে ব্যাপারটা শেষ পর্য্যন্ত পাস হয়ে গেল। কমরেড রঞ্জনের সেই সময়কার বক্তৃতা বোধহয় পাথর গলাতে পারত। অন্ততঃ সেই মুহূর্তে প্রত্যেকেই চাইছিল— হোক, একটা কিছু হোক। শহীদ বিনায়কের মৃত্যুর প্রতিবাদে সারা জজীপুর ফেটে পড়ুক—শহীদ বিনায়ক অমর রহে……।

কিন্তু একা রঞ্জনদের ইউনিয়নের পক্ষে তা করা সম্ভব নয়। জজীপুরের ৩০ হাজার কর্মীর মধ্যে তারা ছোট তরফ। সুবিমলরাই এখানের অধিকাংশ কর্মীর প্রতিনিধিত্ব করে। যদিও গত ক'বছরে তাদের অনেক কর্মী গ্রেপ্তার:

হয়েছে, আটজন খুন হয়েছে গুণ্ডার গুলিতে বা ছোরায়, তবু এখনও তারাই এখানের সংখ্যা গরিষ্ঠ ইউনিয়ন। রঞ্জনের পরিকল্পনা রূপায়নের জন্য সুবিমলদের সাহায্য চাই-ই।

কিন্তু চাইবার আগেই সুবিমলদের কাছ থেকে যুক্ত শোকমিছিলের প্রস্তাবটা এল। সুবিমল নিজে হাসপাতালে এসেছিলেন। ঘটনাটা ঘটার পর থেকে সারাক্ষণ তিনি খোঁজ খবর নিয়েছেন। শহীদ বিনায়কের বাড়িতেও গিয়েছিলেন। মোটকথা, বিনায়ক যদি তাঁর ইউনিয়নের সদস্য থাকতেন তাহলে যা যা তিনি করতেন এক্ষেত্রেও তার কোন প্রভেদ করেননি।

ব্যাপারটা সুবিমলের পক্ষেও খুব সহজ হয়নি। যুক্ত শোকমিছিলের প্রশ্নে তাদের নেতাদেরও মতভেদ ছিল। সুবিমল হাল ছাড়েনি। বলেছে, আপনারা আমার সঙ্গে থাকুন। পরে এ নিয়ে একটা বিতর্ক হতে পারে। আমার জবাব আমি দেব সেখানে।

—কিন্তু সাধারণ ক্যাডারদের আপনি কিভাবে বোঝাবেন? বলেছিলেন একজন।

—সে ভার আমার, জবাব দিয়েছিল সুবিমল।

সময় বেশী ছিল না। সুবিমল দু'একজন প্রভাবশালী ক্যাডারকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। বলেছিলেন, কমরেড, জঙ্গীপুরের মাটিতে গুপ্তহত্যা রুখতে গেলে এই অ্যালায়েন্স আমাদের চাই-ই। সারা ভারতে বামপন্থী মিলিত জোটের প্রথম পদক্ষেপটি হয়তো ঘটবে এখানেই। উপস্থিত ক্যাডাররা চুপ করে ছিলেন। সুবিমল আবেগের সঙ্গে প্রশ্ন করলেন, এই যে ফ্যাসিষ্ট-বাহিনী একটু একটু করে আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে তুলছে, ওদের এই সাহসের উৎস কোথায় জানেন? উপস্থিত সকলে চুপ করে থাকে।

সুবিমল গলায় দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় মিলিয়ে বলে, এই দুঃসাহসের সবথেকে বড় কারণটা লুকিয়ে আছে আমাদের আত্মকলহের মধ্যে।

সকলে মাথা নিচু করে চুপচাপ শুনছিল। সুতরাং সুবিমল আশা করেছিলেন বেশ কিছু ক্যাডারকে তিনি সঙ্গে পাবেন। কয়েকশো হলেও চলবে। কিন্তু কই কাউকেই তো শেষ পর্য্যন্ত দেখা যাচ্ছে না।

অসুবিধা রঞ্জনকেও কম ভোগ করতে হয়নি। শ্মশান থেকে ফিরে অবধি একটা শূন্যতার অবসাদ বুকের ওপর জগদ্দলের মত বসেছিল। বিনায়ক নেই একথা বিশ্বাস করতেও কষ্ট হয়। এখানে, রঞ্জনদের ইউনিয়নের এই অফিস ঘরে বিনায়কের হাতের স্পর্শ টুকরো টুকরো সর্বত্র ছড়ানো। খবরের কাগজের

কাটিং কাটা থেকে সুরু করে আন্দোলনের নেতৃত্ব করা অবধি কোথায় বিনায়ক না ছিল! অথচ কি অনাড়ম্বর ছিল তার চালচলন! ভাসা ভাসা চোখ দুটো সদাই ছিল কাজ খুঁজে বেড়াতে পাগল! গতকাল মাইকিং করার জন্য আসলে তার যাবার কথাও ছিল না। বৃদ্ধ বাবাকে নিয়ে তার যাবার কথা ছিল কোলকাতায় চোখের ডাক্তারের কাছে। যার মাইকিংএ যাবার কথা হঠাৎ তার ছেলের শরীর খারাপ। শুনে বিনায়ক নিজেই উঠে বসল রিক্সায়, মাইকের বাক্সের পাশে। কাজটা জরুরী ছিল ঠিকই। তবু রঞ্জন জিজ্ঞেস করেছিলেন, বিনু তুই কলকাতায় যাবি না? ও বলেছিল, ওবেলা গেলেও চলবে। ততক্ষণে মাইকিংটা সেরে আসি। রঞ্জন খুশিই হয়েছিলেন। সত্যি বলতে কি বিনায়ক কোন কাজের ভার নিলে নিশ্চিন্ত বোধ করা যায়। তবু জিজ্ঞেস করেছিলেন একবার, তাড়াতাড়ি ফিরিস। আর শোন, সঙ্গে কাউকে নিবি? চলন্ত রিক্সা থেকে হাত নেড়ে জানিয়েছিল বিনায়ক তার দরকার নেই।

সঙ্গে কাউকে দেবার প্রয়োজন আছে বলে রঞ্জনও মনে করেননি। তার ইউনিয়নের কোন কমরেডের হৃৎপিণ্ড ছুরির লক্ষ্য হতে পারে কি করেই বা ভাববেন। কয়েক বছর আগে বিভিন্ন কারণে একটা ইউনিয়ন ভেঙ্গে যখন দুটো টুকরো হয়ে গেল একটার নেতৃত্ব গেল সুবিমলদের হাতে আর একটার নেতৃত্ব রইল রঞ্জনদের হাতে। সেই থেকে রঞ্জনরা সরকারী পার্টির সমর্থক আর সুবিমলরা বিরোধী। সুতরাং খুন যারা হচ্ছে তারা সব সুবিমলদেব লোক। তাদের পার্টি সরকারের বন্ধু। তারা শুধু শুধু খুন হবে কেন?

সুতরাং ভাবতে এখনো সংকোচ লাগে, ঘটনাটার খবর পেয়ে এক মুহূর্তে সুবিমলদের ইউনিয়নকেই হত্যাকারী ভেবে নিয়েছিলেন রঞ্জন। কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে যে খবর পেলেন তাতে তিনি বজ্রাহত হলেন। সরকারী ইউনিয়নের পোষা গুণ্ডারা খুন করেছে বিনায়ককে। কিন্তু কেন? কেন? চতুর্দিকে পৃথিবী ঘুরছিল তার চোখের সামনে। সমস্ত রূপ-রস-বর্ণ অদৃশ্য হয়েছিল অকস্মাৎ। তিনি দুহাতে চোখ ঢেকে ভেঙে পড়েছিলেন কান্নায়।

কিছুক্ষণ পরেই সরকারী ইউনিয়নের তরফ থেকে দূত এসেছিল ক্ষমা চাইতে। রঞ্জন রেগে আগুন হয়ে তাকে অপমান করে ফেরৎ পাঠিয়ে ছিলেন। তারপর এসেছিল অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব। ব্যাপারটা যেন চেপে যাওয়া হয়। কিন্তু কিছুতেই রঞ্জনকে টলানো যায়নি। বিনায়কের মৃত্যু তাকে এক নতুন মানুষে পরিণত করেছে। তিনি অহরহ এক মর্ম যাতনায় বিদ্ধ হচ্ছিলেন। সহকর্মীদের পর্যন্ত কেউ কেউ অনুরোধ করেছিল ব্যাপারটা সম্পর্কে পার্টির ওপর

তলার কর্তাদের মতামত না পাওয়া পর্যন্ত যেন কিছু করা না হয়। কিন্তু রঞ্জন শোনেন নি। সরকারী ইউনিয়নের গুণ্ডারাই হত্যাকারী একথা লিখে প্রেস হ্যাণ্ডনোট পাঠিয়েছেন নিজের হাতেই।

সকালেই সেখবর ছেপে বেরিয়েছে তিন চারটি কাগজে। তবু রঞ্জন কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলেন না। বুকের ভেতর থেকে প্রতিশোধের ইচ্ছাটা আগুনের হলকার মত ক্ষণে ক্ষণে প্রকাশ পাচ্ছিল চোখে মুখে। ইচ্ছে করছিল জঙ্গীপুর কারখানা শহরটার সমস্ত কর্মীকে ডাক দিয়ে বলেন, জোরালো দাবী তুলুন আপনারা যতদিন গুপ্তহত্যা বন্ধ না হয় ততদিন কারখানার একটি চাকাও ঘুরবে না, একটি আলোও জ্বলবে না। খুনী গুণ্ডাদের ধরে এনে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড় করিয়ে সমস্ত জঙ্গীপুর শ্রমিকদের বলেন তাদের মাথায় থুতু ফেলতে। তবে তাঁর মনের ক্ষোভ মেটে। তবু বিনায়কের ক্ষতি কি তাতে মিটবে।

কিন্তু এসব কিছুই করতে পারবেন না তিনি। দেশের এই অবস্থায় ধর্মঘটের বিরোধী তাঁর দলের নেতারা। তাছাড়া শাসকপার্টির বিরুদ্ধে এসময় কিছু বলতে বা করতে গেলে ওপর থেকে অনুমোদন নিতে হবে। কারণ সেখানে একটা সমঝোতা চলছে। মুস্কিল আর একটা ব্যাপারেও। ইতিপূর্বে সুবিমলদের ইউনিয়ন কর্মী যখন খুন হয়েছে তাঁরা কোথাও কোন প্রতিবাদ করেননি। বরং, নিজের কাছে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, তাঁরা এই রকম একটা প্রচার চালাতে চেষ্টা করেছিলেন যে নেতারা নিজেদের পিঠ বাঁচাতে সাধারণ ক্যাডারদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাঁদের এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে সরকারী ইউনিয়নের লোকেরা স্বেচ্ছাচার চালিয়েছে। এতদূর বেড়ে উঠেছে তারা যে বিনায়ককে খুন করে তারা রঞ্জনের কাছে ক্ষমা চাইতে আসার স্পর্দ্ধা করে! টাকার লোভ দেখায়। নাঃ, রঞ্জন নিজের মনে নিজেই বলে ওঠেন, আর নয়, অনেক ভুল করেছি, আর করবোনা।

সুতরাং যুক্ত শোকমিছিলের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিল যারা তাদের কাছে তিনি হার মানেন নি। দীর্ঘ মর্মস্পর্শী বক্তৃতায় তিনি অনেক রাজনৈতিক তথ্যের অবতারণা করেছিলেন। বলেছিলেন, এদের এই স্বৈরাচার আমাদের রুখতেই হবে। নাহলে তারা সুবিমলদের ইউনিয়নকে খতম করবে আগে তারপর আমাদেরকেও ছাড়বে না। পৃথিবীতে কোথাও ছাড়ে নি। বিনায়কের মৃত্যুটা শুধু আমাদের কাছে একটা ধমকানি। এটা আমাদের বুঝতে হবে। শুধু আমাদের খেয়োখেয়িটাকে কাজে লাগিয়ে ওরা নিজেদের জমি তৈরী করছে।

মিটিংএ সেদিন তাঁর ভয়ঙ্কর মূর্ত্তির সামনে বিরোধীরা পরাজয় স্বীকার করেছিল। সুমিলদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের কথা যারা বলতে এসেছিল তাদের তিনি স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন, আমি জানি তারা এই ঘটনা থেকেও রাজনৈতিক ফয়দা তুলতে চেষ্টা করবে কিন্তু সেটা আজ খুনীরা যে ফয়দা তুলছে তার থেকেও কি খারাপ হবে? না কমরেড, ওদের সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক বিরোধ আছে স্বীকার করি কিন্তু সেটাকে বর্তমান স্তরে অনাবশ্যক অ্যান্টাগনিষ্টিক করে তোলার সময় আসেনি। আমাদের এই বামপন্থী দলগুলির অন্তর্বিরোধ প্রতিবিপ্লবীদের যত সহায়তা করেছে জনগণের বিপ্লব কিন্তু সেই গতিতে আগাচ্ছে না।

কিন্তু এত কথার পরেও কেউ আসেনি। দশটাব সময় শোকমিছিল বেরোবার কথা অথচ কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

কমরেড রঞ্জন চিন্তার জাল সরিয়ে কমরেড সুবিমলের দিকে তাকিয়ে স্মিত হাসলেন। সুবিমল নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে তার জবাব দিলেন। তাঁর মনও চিন্তায় অস্থির।

—আগানো যাক

—হ্যাঁ এখানে দাঁড়িয়ে থেকে আর লাভ কি?

—পথে বড় কাঁটা। এগোতে চাইলে এগোনো যায় না।

—তবু আগাতে তো হবেই।

দুজনে নিঃশব্দে এগিয়ে চলল। পায়ের তলায় কালো পিচের রাস্তা। মাথার উপর রৌদ্রতপ্ত আকাশ। দুপাশে সারি সারি গাছ। গাছের ফাঁকে একই আকারের কোয়ার্টারের সারি। রাস্তায় ইতস্ততঃ দুএকজন পথচারী। তাদের দুজনকে বহুদিন পর একসঙ্গে দেখে বিস্মিত হোল। আনন্দিত হোল কেউ কেউ। কেউ কেউ দুহাত তুলে অভিবাদন জানাল। কিন্তু দুজনেই অন্যমনস্ক ভাবে অভিবাদনের উত্তর দেওয়া ছাড়া কোন কথা বলছিল না।

কিছুদূর গিয়েই রঞ্জনদের ইউনিয়নের ছেলেদের সঙ্গে দেখা। বোঝা গেল মিছিলের জায়গায় আসতে আসতে এখানে থমকে গেছে তারা। একজন উত্তেজিত ভাবে কথা বলছিল, রঞ্জনকে দেখে থেমে গেল। রঞ্জন দ্রুতপায়ে এগিয়ে গেলেন।

কিছুক্ষণ ধরে সকলের মুখের রেখাগুলি দেখে নিয়ে গম্ভীর ভাবে রঞ্জন প্রশ্ন করলেন, তোমরা গেলে না?

বক্তৃতাকারী সেই ছেলেটি এবার এগিয়ে এল বুক চিতিয়ে, না রঞ্জনদা,

যুক্তফ্রন্ট করতে গিয়ে যে শিক্ষা আমরা পেয়েছি তাতে ওদের সঙ্গে কোন কিছুতেই থাকা আমাদের উচিৎ হবে না।

অন্য আর একটি ছেলে কথায় খেই ধরে এগিয়ে এল সামনে। বলল, আমাদের কমরেড খুন হয়েছে, তাতে ওদের এত মাথা ব্যথা কেন? আপনি বুঝতে পারছেন না রঞ্জনদা ওরা আমাদের কাঁধে বন্দুক রেখে লড়াই করতে চাইছে। এ প্রস্তাবে সায় দেবেন না আপনি।

রঞ্জন চুপচাপ শুনে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ তন্দ্রাচ্ছন্ন মানুষের মত সামনের চাতালটায় দ্রুতপায়ে উঠে দাঁড়ালেন, তাহলে কমরেডস এটাই আপনাদের সকলের কথা? রঞ্জন জিজ্ঞাসু দৃষ্টির টর্চ ফেললেন সকলের মুখে।

সকলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। শুধু বক্তৃতাকারী সেই ছেলেটি গলায় আত্ম-বিশ্বাসের স্বর এনে বলে, হ্যাঁ এটাই আমাদের সকলের কথা।

অভিমানে থমথমে রঞ্জনের মুখ। চাতাল থেকে নেমে আসতে আসতে বললেন, এদেশের সর্বহারাদের দুর্ভাগ্য—বিপ্লব এখনো অনেক দূর।

সমস্ত পরিস্থিতিটা একটা দুঃসহ নৈঃশব্দে জীর্ণ হচ্ছিল। সুবিমল পায়ে পায়ে কখন চাতালটায় উঠে পড়েছে বোধহয় নিজেও খেয়াল করেনি। হঠাৎ সুবিমলের গমগমে গলার স্বরে সকলের চমক ভাঙে।

কমরেডস, সুবিমল সকলের দৃষ্টির কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে সম্বোধন করলেন, যুক্ত শোকমিছিলের প্রসঙ্গে যেসব প্রশ্ন উঠেছে সেগুলো নিয়ে আমি কিছু বলতে চাই।

কেউ কেউ হল্লা করে সুবিমলকে থামিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু রঞ্জন হাতের ইঙ্গিতে তাদের বারণ করলেন।

সুবিমল গলাটা একটু ঝেড়ে নিয়ে আবার শুরু করলেন, না কমরেডস, আপনাদের কাছে আমার ইউনিয়নের গুনগান করতে আসিনি। আপনাদের কাছে কয়েকটা প্রশ্ন আমি করতে চাই। ধরুন একই বিষয়ে যদি দুজনের দুটি ভিন্ন মত থাকে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়? সকলে চুপ।

তাহলে এমন কি হতে পারে না যে একজনের মত সঠিক অন্যজনের মত ভুল—অথবা দুজনের মতই ভুল। একথা আপনারা সকলেই মানবেন আশা করি যে একই বিষয়ে একই সময়ে দুটি মতই সঠিক হতে পারে না।

দু'একজন বলে উঠল সে ত ঠিকই। এতে আর বলার কি আছে।

বলার আছে বৈকি, সুবিমল গলায় আত্মবিশ্বাস এনে বলে এছাড়া আরো একটা সম্ভাবনা আছে কমরেড। দুজনের মতই আংশিক সত্য হতে পারে।

আর অন্ধের হস্তি দর্শনের মত সেই আংশিক সত্যটাকেই আঁকড়ে ধরে আমরা দাবী করতে পারি যে আমিই সঠিক। আর এটাই যত গণ্ডগোলের মূলে···।

শ্রোতারা কলরব করে, সংক্ষেপ করুন, সংক্ষেপ করুন।

সুবিমল বলে চলে, আপনারা বলছেন জনগণের বিপ্লব চাই, আমরাও তাই বলছি। কিন্তু দুজনার দুটো পথ। তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো?

শ্রোতাদের দু'একজন বলে উঠল, আপনারাই ভুল আমরা সঠিক।

সুবিমল বহু চেষ্টায় নিজেকে সংযত করল, ঠিক এই দাবীটা আমাদের কমরেডওরাও যদি করেন, করবেনই তাহলেই লাগল বিরোধ। কিন্তু সঠিক পথ খুঁজে বার করার এটাতো মার্ক্সীয় পথ নয় কমরেড······।

পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলেন সুবিমল। 'কমরেডস, এরজন্য যা দরকার প্রথমেই, তা হোল পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা আর খানিকটা ধৈর্য্য। আলোচনা পর্যালোচনা করেই এই পথ খুঁজে বার করতে হবে। আমাদের দুর্ভাগ্য পরপর দু দুটো যুক্তফ্রন্ট পার হয়ে আসার পরও একাজে আমাদের সাফল্য উল্লেখযোগ্য নয়—বরং সমাধানের বদলে আমরা ক্রমশঃ জড়িয়ে পড়েছি বিরোধিতার এক দুর্ভেদ্য জালে। এমন কি আমাদের চরম কোন দুঃসময়ে আমরা একসঙ্গে হাঁটতে পর্যন্ত পারিনা। যেমন গতকাল ঘটেছে, যেমন ঘটেছিল গত আগষ্ট মাসে, জুলাই মাসে, জঙ্গীপুরের বুকে একটার পর একটা খুন হয়ে গেছে, আমরা নিঃশব্দে চোখের জল ঝরিয়েছি—কিন্তু এক শোকসভায় দাঁড়িয়ে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে আমরা একসাথে গর্জন করে উঠতে পারিনি। আপনারা হয়তো ভেবেছিলেন প্রতিবাদ জানাবার আপনাদের দরকার নেই: যে নিরাপদ আশ্রয় আপনাদের নেতারা তৈরী করে দিয়েছেন আপনাদের জন্য—সেখানের গণ্ডীর ভেতর ঘাতকের ছুরির ডগা পৌছবে না—শহীদ কমরেড বিনায়ক নিজের মৃত্যু দিয়ে সে ভুল আপনাদের ভেঙ্গে দিয়ে গেলেন'।

উপস্থিত ক্যাডারদের মধ্যে একটা চঞ্চলতা দেখা গেল। রঞ্জনের চোখ পুনরায় ছলছল করছিল। দীর্ঘশ্বাস ফেলল কয়েকজন। সুবিমল বলল, কমরেডস, আমি আবার বলছি আপনাদের দোষারোপ করতে আমি এখানে আসিনি। ভুল যারই হোক, সে ভুলটাকে আর সামনের দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কি? এ সময় বিভেদের সময় নয়—দূরে সরে থাকার সময় নয়। আসুন, আমরা সকলে মিলে আগে এই দানবটাকে বধ করি। তারপর

আমাদের ঘরের ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার সুযোগ অনেক পাব। আজ পরিস্থিতি আমাদের এক ঐতিহাসিক কর্তব্যের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে। এ যদি আমরা পালন না করি, ভবিষ্যত কাল আমাদের ক্ষমা করবে না।

সুবিমল ধীরে ধীরে নেমে এল চাতালটা থেকে। সকলের মাঝখানে দাঁড়ালেন। ক্যাডাররা অনেকেই তার পরিচিত। দুএকজনকে তিনি নাম ধরে সম্বোধন করলেন। পিঠ চাপড়ালেন কারুর কারুর। অনুভব করলেন সমবেত জনতার ইচ্ছাটা। বক্তৃতাকারী সেই ছেলেটি এগিয়ে এল আবার। তারও চোখে জল। সে এসে কমরেড সুবিমলের হাত ধরল। সুবিমল বললেন, তোমরা সকলে মিছিলের জায়গায় চল আমরা আসছি।

রঞ্জনকে নিয়ে সুবিমল আবার রাস্তায় নামলেন। সাফল্যের আনন্দে তার চালচলনে একটা ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হচ্ছিল। এখনো একটা কাজ বাকি আছে। তাঁর নিজের ইউনিয়নের ক্যাডাররা আসেনি।

একটা বাঁক ঘুরতেই ইস্কুলবাড়িটার পাশে তাদের দেখা গেল। গোল হয়ে বসেছিল তারা বাড়িটার ছায়ায়। পরস্পর বাদানুবাদ করছিল। তাদের তর্কাতর্কির উচ্চকণ্ঠ সুবিমল ও রঞ্জনের কানে আসছিল। একজন বলছিল, না—কমরেড সুবিমল ভুল করছেন, সংশোধনবাদীদের সঙ্গে কোন ব্যাপারে সংশ্রব থাকতে পারে না……এতে আমাদের ক্ষতি হবে…। বাঁকটা ঘুরে সুবিমল রঞ্জনকে নিয়ে উপস্থিত জনতার পাশে এসে দাঁড়ালেন। সকলের দৃষ্টি আটকে গেল সুবিমলের পাশে রঞ্জনকে দেখে।

ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবে রঞ্জন এদের সকলের কাছে পরিচিত। '৬৮তে ইউনিয়ন ভেঙে দুটুকরো হবার আগেও তিনি ছিলেন ইউনিয়নের জয়েণ্ট সেক্রেটারী। তারপর নতুন ইউনিয়নের জন্ম থেকেই তিনি সাধারণ সম্পাদকের পদে রয়েছেন। উপস্থিত ক্যাডারদের অনেককেই তিনি রাজনৈতিক জীবন শুরু করতে দেখেছেন। এমনকি তাঁর কাছে তালিম পেয়েছেন এমনও আছেন দু'একজন।

সুবিমল এগিয়ে এলেন, কি ব্যাপার তোমরা গেলে না?

বেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধতা। তারপর ভীড়ের ভেতর থেকে একজন বলে উঠল, পরপর আমাদের আটজন কমরেড এই জঙ্গীপুরের মাটিতেই শহীদ হয়েছেন, কই তখন তো রঞ্জনবাবুদের পাত্তা পাওয়া যায় নি। তখন তাঁরা আমাদের দিকে তাকিয়ে হেসেছেন। না কমরেড, এসব জোড়াতালির মধ্যে আমরা নেই।

গালে যেন সজোরে একটা চড় খেলেন সুবিমল। ফ্যাকাশে মুখে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। কাল থেকে এত চেষ্টা এত বাদানুবাদ, কিছুই তাহলে ওদের মনে দাগ কাটেনি। সমস্ত পরিস্থিতিটার রাজনৈতিক বিশ্লেষণের থেকে প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে অভিমান। সুবিমল কথা খুঁজে না পেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

পায়ে পায়ে এগিয়ে এলেন রঞ্জন। কিছু বলা উচিত হবে কিনা এক মুহূর্ত ভাবলেন। গলা খাঁকারি দিলেন একবার। তারপর সুবিমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি কয়েকটা কথা বলব ?

দু'একজন উঠে দাঁড়িয়ে বাধা দিতে চেষ্টা করেছিল। সুবিমল গ্রাহ্য না করে বলল, নিশ্চয় নিশ্চয়-বলুন।

বহুদিন পর এদের কাছে বক্তৃতা করতে একটু বাধোবাধো ঠেকছিল রঞ্জনের। সাবধান হতে গিয়ে পিছলে যাচ্ছিলেন তিনি। বললেন, কমরেডস, যে যন্ত্রণা আজ আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে সে যন্ত্রণা আপনাদেরও ভোগ করতে হয়েছে একবার নয় আট আটবার। আমি বুঝতে পারছি আমাদের ভুল হয়েছিল, মস্ত ভুল হয়েছিল, আমরা আপনাদের পিছনে দাঁড়াইনি।

রঞ্জন আর একবার গলা ঝাড়লেন। একটি দুটি করে লোক এসে সভায় যোগ দিচ্ছে। খরতাপ সূর্য্য এসে দাঁড়িয়েছে মধ্যগগনে। রঞ্জন আবার বললেন, কমরেড বিনায়ক নেই একথাটা এখনো যেন ভাবাই যায় না। রিক্সায় করে তিনি মাইকিং করছিলেন তখন সরকারী গুণ্ডারা তাঁকে আক্রমণ করে। তবু বীরের মত লড়েছিলেন তিনি এতগুলো নরপশুর সাথে। তাঁর হাত আঘাতে আঘাতে ছিন্ন বিছিন্ন হয়েছে—অবশেষে গুণ্ডারা ছোরার আঘাতে তার হৃৎপিণ্ড বিদ্ধ করেছে।

না কমরেডস্, শোকের দিন বা সরে থাকার দিন আজ নয়। ভুল যা হবার তা হয়েছে। কমরেড বিনায়কের মৃত্যু না হলে, বুক নিংড়ে হাহাকার না ঝরলে এই ভুল আরও কতদিন চলত কে জানে। কমরেড বিনায়ক আমাদের একই শোকের আঙিনায় এনে দাঁড় করিয়েছেন।

সুবিমল ক্ষণে ক্ষণে বিস্ময়ে চমকে উঠছিলেন। কমরেড রঞ্জনের বুকের ভেতরটা যেন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছিলেন তিনি! একজন প্রিয় কমরেডের মৃত্যু কত মর্মান্তিক আঘাত করলে তবে জনান্তিকে নিজের ভুল স্বীকার করতে পারেন রঞ্জন। অথচ এই তো মাত্র ছ'মাস আগে! জয়ন্ত ফিরছিল কারখানা থেকে। মেঘলা আকাশ তার উপর লোডশেডিং, কমরেড জয়ন্ত প্রায় পৌঁছে গেছল দরজার কাছে। সেখানেই তাকে অতর্কিত অভ্যর্থনা জানাল ঘাতকের ছুরি। জয়ন্তর স্ত্রী বেরিয়ে এল চিৎকার শুনে। কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ। উঃ সে কি দিন ; মনে পড়লে এখনো যেন হৃৎপিণ্ডটা কেউ খামচে ধরে। কেউ এগিয়ে আসেনি। কেউ সাড়া দেয় নি। সুবিমলরা কয়েকটি ফাঁকা সান্ত্বনার বাণী ছাড়া আর কিছুই করতে পারেনি সেদিন। কৌরব সভায় কৃষ্ণার লাঞ্ছনার সময় ভীমের ফেটে পড়তে চেয়েছিল সারা শরীর। যৌথ একটা উদ্যোগ নেবার প্রস্তাব করে গিয়েছিলেন সেদিন রঞ্জনের কাছে বারবার, সাড়া মেলেনি।

সিনেমার রীলের মত মুহূর্তে সবকিছু ঝলসে উঠছিল সুবিমলের মনের পর্দায়। রঞ্জন তখনও বলে চলেছেন, ব্যাপারটাকে চাপা দেবার জন্য চেষ্টা

হয়েছিল অনেক মহল থেকে। কিন্তু আমি রাজী হই নি। না কমরেড, ভুল আর নয়। ওরা অনেক বেড়েছে—বাড়তে বাড়তে ওদের স্পর্দ্ধা আকাশ ছুঁয়েছে। আপনাদের আমাদের বিরোধ বেড়েছে আর সেই সুযোগে ওরা অক্টোপাশের মত ওদের কালো হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। দেশের মানুষের দুঃখ দূর করার দিকে ওদের নজর নেই, ওরা শুধু চায় যে কোন উপায়ে নিজের স্বার্থরক্ষা করতে……

সুবিমল নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। সত্য, নাকি স্বপ্ন দেখছেন! ৭১'এর ভোটের আগে এদের সঙ্গে মিটিং-এর পর মিটিং—যেওনা, ওদের এমন করে বাড়িও না। কিন্তু সুবিমলদের প্রতি বিদ্বেষে ওরা যেন পাগল হয়ে গেছল। কমরেড রঞ্জন পর্য্যন্ত অনেক জনসভায় সুবিমলদের উদ্দেশে এমন কুৎসা করেছেন যে তা বলা যায় না। সুবিমলদের বহু কর্মী এখনও গুণ্ডাদের অত্যাচারে জঙ্গীপুর ছাড়া। কিন্তু রঞ্জনরা কোনদিন কোন সাহায্য করেনি। আজ কি তাহলে রঞ্জনদের মনে অনুতাপ এসেছে—নাকি শুধু সাময়িক শোকের উচ্ছ্বাস!

সুবিমল নিঃশব্দে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন, মনে মনে একটু আনন্দের শিহরণ খেলে গেল তার। তবে কি সেই সুদিন আগতপ্রায়—আসমুদ্র হিমাচলের শোষিত মানুষ গর্জন করে ডাক দেবে শোষকদের, তোমরা দূর হটো। আমরা এসেছি আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নিতে' আর সেই সুদিনের বীজ কি বোনা হতে চলেছে তাঁরই হাতে!

শ্রোতাদের চোখে বিস্ময়। রঞ্জন তখনো বলে চলেছেন, কমরেডস ভুল সকলেরই হয়, মানুষেরই ভুল হয়। কিন্তু সে ভুল স্বীকার করার সাহসই মনুষ্যত্বের পরিচয়। এতে ভবিষ্যতের ক্ষতিটা শুধরে নেওয়া যায়। কিন্তু যে ভুল স্বীকার করে তাকে কিন্তু ব্যঙ্গ করে ফিরিয়ে দিতে নেই; তাহলে পরে পস্তাতে হয়। আসুন আজ সব ভুল মিটিয়ে হাতে হাত দিয়ে আবার আমরা উঠে দাঁড়াই। হয়তো সকলের সঙ্গে সব সময় মতের মিল না হতে পারে, কিন্তু একই লক্ষ্যে হেঁটে চলব এই প্রতিশ্রুতি থাকলে সে অমিল সহজেই মেটানো যায়।

রঞ্জন একবার কব্জিতে বাঁধা ঘড়ির দিকে তাকালেন, একবার চোখ তুলে দেখে নিলেন সূর্য্যের অবস্থান। তারপর আবার বলে চললেন, কমরেড বেশী সময় আর নেবনা। বেলা বেড়ে যাচ্ছে। আমি শুধু একটি প্রস্তাব করব আপনাদের কাছে—

রঞ্জন একটু থমকে গেলেন, যেন নিজের ভিতরে ডুব দিলেন খানিকক্ষণের জন্য। সকলের উৎসুক দৃষ্টি রঞ্জনের দিকে। রঞ্জন বললেন, আজ সকালে শান্তনুরাও এসেছিল আমার কাছে। তারাও আমাদের সঙ্গে যাবে বলেছে।

দাবী তুলবে তারাও। আমাদের যুক্ত কার্য্যক্রমে তারাও যোগ দিতে চায়। আপনারা ভেবেচিন্তে আমাকে অনুমতি দিন।

স্মৃতি, স্মৃতি! চার পাঁচ বছর আগেকার কথা মনে পড়ে যায় সুবিমলের। শান্তনু ছিল তাদের ইউনিয়নের একজন নামকরা কমরেড। শক্ত সমর্থ চেহারা। প্রতিটি কাজে সে ছিল সবার আগে। সারা দেশ জুড়ে বামপন্থী আন্দোলনে যখন দ্বিতীয়বার ভাঙন এল—শান্তনু ভেসে গেল। সঙ্গে টেনে নিয়ে গেল অনেক বাছা বাছা কমরেডকে। সুবিমলদের সঙ্গে মতপার্থক্যটা পরিণত হোল শত্রুতায়। গত ক'বছরে শান্তনুদের বহু ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে। বহু ভালো ছেলে মারা গেছে পুলিশের গুলিতে। অনেকে অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য জেলখানায় বন্দী। সুবিমলের বুকে একটা চাপা ব্যথা ছিল, এদের জন্য কিন্তু কিছুই করতে পারা যায়নি। জেলখানায় বন্দীদের পর্য্যন্ত যখন বারবার নানারকম অজুহাতে গুলি করে মারা হয়েছে, সুবিমল অসহায় ভাবে শুধু খবরের কাগজের পাতা উলটিয়েছে। সেই শান্তনু তাহলে আবার ফিরে আসছে!

আনন্দে দুলে উঠল বুকটা। রঞ্জন জনতার উত্তরের আশায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। সুবিমল এগিয়ে এলেন। ছোট ছেলের মত আনন্দে চিৎকার করতে লাগলেন। ইতিহাসের এই মহাসন্ধিক্ষণে নিজেদের ভুল স্বীকার করে বিপ্লবের প্রতি এক মহান দায়িত্ব পালন করলেন কমরেড রঞ্জন। আমাদের নিজেদের ভুলও আজ আমাদের স্বীকার করার বোধ হয় প্রয়োজন আছে। শান্তনুরাও ভুল করেছিল। আজ তারা নিজেরা বুঝতে পারছে। সুতরাং কমরেডস, সবকিছু ভুল ত্রুটি আপাততঃ সরিয়ে রেখে আসুন আমরা একত্রিত হই। আমাদের মূল শত্রুকে আগে উৎখাত করি—তারপর নিজেদের বিচার আমরা নিজেরাই করব। আপনারা কি আমার প্রস্তাবে রাজী?

সুবিমল আত্মহারা হয়ে দেখলেন সবকটা হাত আস্তে আস্তে উপরদিকে উঠে গেল। তারপর মাটির বুকে সোজা ভুঁইচাঁপা ফুলের মত হাতগুলি ফুটে রইল।

কমরেড সুবিমল পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের কোণে চিক্ চিক্ করা আনন্দাশ্রুর ফোঁটাটি মুছে নিলেন। []

একটি না-লেখা গল্পের ভূমিকা

মাননীয় সম্পাদক মশায়,

আপনাদের পত্রিকায় পুজো সংখ্যার জন্য যে গল্পটি আমার পাঠাবার কথা, বিনীতভাবে আমি ক্ষমা চাইছি, সে গল্পটি আমি পাঠাতে পারব না। জানি, আপনি হতাশ হবেন, অসন্তুষ্ট হবেন। অসুবিধাও হবে আপনার যথেষ্ট। এমনকি এও জানি, আমার পক্ষে ব্যাপারটা ভাল হবে না, তথাপি আমি পারলাম না। আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।

না, গল্প আমি লিখতে পারিনি তা নয়। ইচ্ছে করে লিখিনি। খানিকটা লিখেছিলাম। গল্পটা মাথার মধ্যে রেডি ছিল। আর আপনি তো জানেন মাথার মধ্যে গল্প রান্না হয়ে থাকলে ঢেলে ফেলতে আর কতক্ষণ! তরতর করে লেখা এগোচ্ছিল। কত আগেই শেষ হয়ে যেতে পারত। শুধু যদি মাঝখানে ঘটনাটা। তবু খুলেই বলি শুনুন।

আপনি জানিয়েছিলেন কারখানার পটভূমিকায় গল্প আপনার পছন্দ। বিশেষতঃ, আমি কারখানায় আছি বলে আপনি এই বিষয়টার উপর জোর দিয়েছিলেন। মোটামুটি আপনি বলে দিয়েছিলেন, নায়ক নিচুতলার লোক হলেই ভালো। তাতে লেখায় সমাজবোধের পরিচয় মেলে। আমি বুঝেছিলাম আর শুরুও করে দিয়েছিলাম নায়ক খোঁজাখুঁজি। বলাবাহুল্য, নায়ক বলতেই পাঠকদের চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে, ফর্সা ছ ফুট লম্বা স্বাস্থ্যবান চেহারা, সর্ববিদ্যা বিশারদ, দারুণ স্পীড তুলে গাড়ি চালায়, মেয়েরা যাকে পাবার জন্য পাগল—সেরকম কারুর কথা আমার মনে আসেনি। আমি শুধু চাইছিলাম লোকটির যেন অন্ততঃ খানিকটা বৈশিষ্ট্য থাকে। ভালো হোক মন্দ হোক আশেপাশের আর পাঁচজনের থেকে যেন তাকে একটু আলাদা মনে হয়। এখানের হাওয়াকে বড় ভয়। তার এমনই একটা সরলীকরণ স্বভাব, যা বায়ুর অক্সিজেনের মত মানুষের মনে যেখানে যতটুকু স্বাতন্ত্র্যের অনমনীয় লৌহতা আছে দ্রুত তাকে আক্রমণ করে মরিচায় রূপান্তরিত করে দেয়।

চারপাশে উঁচু পাঁচিল ঘেরা বিশাল টানা শেড। তার তলায় ক্রেন, রোপ

ইলেকট্রিক তার গ্যাস পাইপ আর আগুনের এ এক বিচিত্র জগৎ। শিফটে শিফটে লোক বদল হয়। কাজ শেষ করে কয়েক হাজার লোক চলে যায় কয়েক হাজার নতুন লোক এসে হ্যাণ্ডেল ধরে। খাবার সময় দীর্ঘ লাইন পড়ে ক্যান্টিনে। আর আমি প্রতিটি মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আমার আগামী গল্পের নায়ককে খুঁজি।

রাত তখন দেড়টা।

সমস্ত শরীরের মধ্যে পেট জায়গাটা যেরকম, খাদ্যনালী বেয়ে খাবার এসে জমা হয়—তারপর হজম করা খাদ্যরস সেখান থেকে রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। কারখানার মধ্যে এই ব্লুমিং মিল জায়গাটা সেরকম। স্টীল মেল্টিং শপ থেকে ছাঁচে ঢালাই করা ইস্পাতপিণ্ড (আমরা তাকে বলি ইনগট), লাল টকটকে বিরাট এক একটা বেঁটে চারকোণা থামের মত দেখতে, এখানে এসে ছোট চৌকোণা সাইজের ব্লুমে রূপান্তরিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ে সারা কারখানাটার বিভিন্ন বিভাগে। জঠরাগ্নির মতই বিশাল বিশাল ফার্নেস দিবারাত্র জ্বলছে এখানে। রোলিং-এর আগে গরম ইস্পাতপিণ্ডকে আরও গরম করার জন্য এদের প্রয়োজন। এই মিলটায় আবার সকাল বিকেল দুটো শিফটে কাজ হয়। রাত্রে শুধু ফার্নেসে ইস্পাতপিণ্ড বোঝাই করে গরম করে রাখে। রাত্রে লোকজন তাই কম। যে ক'জন আছে এই বর্ষার রাত্রে সুবিধে মত এক একটি কোটর খুঁজে নিয়ে কে যে কোথায় গড়িয়ে পড়েছে খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য। কণ্ট্রোল কেবিনে বসে আমি একটা নভেল পড়ছি আর মাঝে মাঝে তার নায়কের কথা চিন্তা করছি। আমার পিছনে একটি টুলের উপর বসে করমু ঢুলছিল। তার এই ঝিমুনিটি এমনই প্রাত্যহিক ও সশব্দ যে আমি তার দিকে না তাকিয়েও তার ঘুমন্ত অস্তিত্ব টের পাচ্ছিলাম।

করমু আমাদের শিফটের সবচেয়ে কম বেতন পাওয়া লোক। নাইট শিফটে তাকে বসিয়ে রাখি কাছেই। কাজকর্মের জন্য কাউকে দরকার হলে ওই গিয়ে লোকজন ডেকে আনে। সেদিনের মত কাজকর্ম ইতিমধ্যে শেষ। কাউকে আর ডাকার দরকার হবে না বুঝে করমুকে বললাম—এখন তো আর কাজ নেই। বাইরে কোথাও ঘুমুতে যাবে তো যাও।

সে চমকে জেগে উঠে সোজা হয়ে বসল। যেন বড় লজ্জা পেল। সে আনস্কিলড্ ওয়ার্কার, আমি তার চার্জম্যান। আমি স্বয়ং তাকে ঘুমোতে

যেতে বলছি। হয়ত এ কথাটার অন্য মানে করল সে। সসঙ্কোচে ভাঙা ভাঙা বাংলায় যা বলল আমাকে তা হোল, আজ ওর এক বোনাই এসেছে ওর বাড়ি। দুজনে মিলে আজ একটু বেশি দারু পিয়েছে তাই ঘুম পাচ্ছে। আমি যেন ওর এই কসুর মাফ করে দিই। আমি আবার বললাম, সাচ সাচ বলছি তুমি শুতে যাও। আজ রাতের মত আর কোন কাজ নেই। কাউকে ডাকবারও জরুরত নেই।

ও তবু গেল না। শুধু আরও বেশি জড়সড় হয়ে বসল। এবং জানাল এবার সে হুঁসিয়ার হয়ে গেছে এবং আর আমার অসুবিস্তা ঘটাবে না।

বড মজা লাগল আমার। চুপসানো গালের উপর উঁচু উঁচু হাড়, তামাটে চামডার উপর জ্যালজেলে একটা খাকি সোয়েটার পরা করমুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,

—তা করমু, কতটা দারু পিয়েছ আজ ?

—দু' পুহা বাবু, সলজ্জ ভঙ্গিতে হাত কচলাতে কচলাতে উত্তর দেয় সে।

—দু'পোয়া! আর অন্যদিন ?

—এক পুহা।

—রোজ ?

হুঁ, সুবা ঔর সাম!

—আর তোমার ঔরৎ ?

—উ ভি পিয়ে থোড়া থোড়া।

—বাব্বাঃ, মাইনে তো পাও মোট দু'শটি টাকা। অত মদ খাবার পয়সা জোটে কোথায় ?

এবার করমুর মুখে একটি গর্বের আলো ফোটে। বলে, হামরা দারু না কিনি বাবু। মুণ্ডালোক হামরা দারু আপনা হাতমে বানাই।

—আচ্ছা! বিস্মিত হই আমি।

নভেল পড়া মাথায় উঠল। করমুকে ঘিরে মাথায় তখন নতুন চিন্তা শুরু হয়েছে আমার। কণ্ট্রোল কেবিনের তলায় চাপা গোঁ গোঁ শব্দে ফার্নেসের ব্লোয়ার চলছে। অটোম্যাটিক রীলে সিস্টেমের থেকে থেকে সুইচ অপারেশনের খটাখট শব্দ। আর কেবিনের কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরের যতটুকু দেখা যায় সব নিস্প্রাণ নৈঃশব্দে মোড়া। সমস্ত চরাচরে যেন আমরাই দুটি মাত্র জীবিত প্রাণী।

—করমু তোমার দেশ কোথায় ?

আমার চকিত প্রশ্নে করমু বিহ্বল হয়। বলে, সে বহুৎ দূর বাবু—ডালটন গঞ্জ।

—ও, তা অতদূর থেকে তুমি এখানে এসে পড়লে কেমন করে?

তখন করমু আমাকে শোনাতে লাগল তার এই ছত্রিশ বছরের জীবনে বহু ঘাটের জল খাওয়ার কাহিনী। নিচে ব্লোয়ারের ব্লেডে ধাক্কা খেয়ে গুমরোতে লাগল বাতাস, ফার্নেসের ভেতর কোকওভেন গ্যাস জ্বলতে জ্বলতে রাশি রাশি কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরী হয়ে হুহু করে বেরিয়ে যেতে লাগল রিকুপারেটরের একজস্ট দিয়ে। ছুটে বেরিয়ে যাওয়া গ্যাসের ধাক্কায় মাঝে মাঝে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল কণ্ট্রোল কেবিন, আর উপন্যাসের মত রোমাঞ্চকর এক কাহিনী শুনতে শুনতে বার বার আমার মনের ভেতর একটা আনন্দ নাড়া দিয়ে যেতে লাগল—পেয়েছি এতদিন আমি যাকে খুঁজছিলাম অবশেষে তাকে পেয়েছি।

তখনই নির্বাচন করে ফেললাম আমার আগামী গল্পের নায়ককে। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, তামাটে রং, ঈষৎ কোল কুঁজো। মাথা ভর্তি ঝাঁকড় মাকড় চুল। চোখ স্বাভাবিকের চেয়ে একটু ছোট। ছোট ছোট কান, একটু বোকা বোকা। কোন কথা বুঝতে সময় বেশি লাগে। সরল। আর তার এই সরলতা প্রতি মুহূর্তে পদদলিত হয়। তার নাম দিলাম জগদীশ। সে কারখানায় কাজ করে। কোন এক ইস্পাত কারখানার ফার্নেসে। এতে আমার খানিকটা বাড়তি সুবিধা এই যে, ফার্নেসের ব্যাপার স্যাপার আমার জানা। সে জানাটাকে কাজে লাগাতে পারব গল্পে।

দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল পাহাড়ঘেরা একটি ছোট্ট গ্রাম। খড়ে ছাওয়া মাটির দেওয়াল। কয়েকটি কুটির। শাল আর মহুয়ার জঙ্গলের ভিতর যেন লুকোচুরি খেলছে। কয়েকটি বাজরার গাছ এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে। পিছনে একদঙ্গল কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মুরগি খুঁটে খুঁটে বেড়াচ্ছে উঠোনে। করমুকে জিজ্ঞেস করে নেওয়া হয়নি সেখানে কোন নদী আছে কিনা। ধরে নেওয়া যাক আছে। একফালি রূপোলী শীর্ণ জলস্রোত শাল মহুয়ার বন ঘেঁসে পাহাড় ঘিরে বয়ে চলেছে কুলুকুলু রবে। সেখানেরই ছেলে জগদীশ। পাহাড় আর নদীর মত প্রাকৃতিক তার কোঁদা শরীর। জঙ্গলের মত দুর্দান্ত তার প্রকৃতি। কিন্তু তাকেও হার মানতে হোল একদিন। এক বছর সমস্ত অঞ্চল জুড়ে এল খরা। শুকিয়ে গেল নদী। গরু বাছুর মুরগী খেতে না পেয়ে পেয়ে মরে গেল। আর জগদীশ তার যুবতী স্ত্রী রুকমিনিকে

নিয়ে বেরিয়ে পড়ল জঙ্গলের আশ্রয় ছেড়ে আরও অনেকের সঙ্গে। তারপর আড়কাঠির পাল্লায় পড়ে··। আড়কাঠির ব্যাপারটা করমুই বলেছিল আমাকে। দলকে দল তাদের চালান হয়ে গেছল ঝরিয়ার কয়লাখাদানে।

পরপর কয়েকটা দিন ধরে গল্পটা আমার মাথায় তৈরী হতে থাকল। একবার একরকমভাবে গড়ি, আবার ভাঙ্গি—আবার নতুন করে গড়ি। ইতিমধ্যে আর একদিন ধরেছিলাম করমুকে।

—আচ্ছা কবমু, এখানে কেমন লাগে তোমার? ছিলে জঙ্গলেব স্বাধীন জীবনে আর এখানে বন্দীজীবন, সব কিছু আলাদা·

—ভাল লাগে বাবু,—আমাকে অবাক করে উত্তর দিয়েছিল সে।

—আচ্ছা, বেতন তো পাও দু'শো টাকা, তাতে তোমার চলে?

—আমাব ঔবৎ ভি কাম কবে হসপিটলে। উ ভি ডেডশ রুপৈয়া কামায়।

—ও, ছেলেপুলে কজন তোমাব?

—তিন লেডকা ঔব এক লেডকি।

—আচ্ছা কিছু মনে কোবনা, ক্রেন অপারেটর প্রসাদেব কাছে নাকি মাঝে মাঝে তুমি টাকা ধার কব, আমি শুনেছি।

এখানে সে উত্তব দিতে গিয়ে হোঁচট খায়। হাত কচলাতে থাকে। আমি বুঝতে পেরে বলি, আমি এমনি জিজ্ঞেস করছিলাম আর কি!

সম্পাদক মশায়, করমুব জন্য কিরকম একটা বেদনাবোধ আমার মাথার মধ্যে ক্রিয়া করছিল। আমি বুঝতে পাবছিলাম। প্রতি মুহূর্তে সংযত করছিলাম নিজেকে। আমি যে লেখক। আমাকে দেখতে হবে সব, বুঝতে হবে। ডাক্তার যেমন নির্দয় বিশেষজ্ঞতায় চিরে ফেলে বোগীর পেট, আমাকেও তেমনি বিশ্লেষণ করতে হবে ঘটনাকে। মণ্ডিত করতে হবে অনুরূপ আবেগহীনতায়।

আমার সঙ্গে আপনার সে কথোপকথনও আমার মনে ছিল। ভুলিনি। আপনি আমাকে হুঁশিয়ার করে দিয়েছিলেন—দেখবেন, আমাদের পত্রিকার আবার একটা ফিলজফি আছে তো। কারখানার গল্প লিখতে গিয়ে আপনি যেন আবার খুব একচোট মিছিল টিছিল ইউনিয়ন-টন দিয়ে একটা স্লোগানের জগাখিচুড়ি বানিয়ে দেবেন না···পুরনো রোগ তো! আমি আপনাকে আশ্বস্ত করেছিলাম, চিন্তা করবেন না। আপনার বিজ্ঞাপন দাতাদের আমি চটাব না। তবে কারখানার গল্প লিখতে গেলে এসব কি পুরোপুরি বাদ দিলে চলে? তবু নিশ্চিন্ত হতে না পেরে এবার অন্যদিক আর একটু রাশ টেনে দিয়েছিলেন—কি জানি মশায় আপনার 'নীল সায়রের অপর পারে' বইটা সিনেমা না হয়ে যাওয়া

অব্দি আমার স্বস্তি নেই—এসময় কিছু একটা হয়ে ব্যাপারটা ভেস্তে যাক—এটা নিশ্চয় আপনি চান না।

সম্পাদক মশায়, আপনি আমার মত লোকদের দুর্বলতার কথাটা খুব ভাল করেই জানেন। আপনি জানতেন এমন একটা সুযোগ আমি নিজে থেকে ভেস্তে দোব তেমন মূর্খ আমি নই।

সুতরাং গল্পটা নিয়ে আবার আমাকে ভাবতে হোল। সমস্যার কথা বলতেই এক বন্ধু বললেন, নায়কের যৌনজীবনটাকে ধরতে। তাঁর বিশ্বাস কারখানার এই স্তরের মানুষের যৌনজীবন পাঠকদের কাছে জনপ্রিয় হবে। কিন্তু পরামর্শটা আমার মনঃপূত হোল না। যৌনজীবন তো আজকাল পত্র-পত্রিকায় অনেক বেরোচ্ছে—ওতে আর নতুনত্ব কিছু নেই। ভাবতে ভাবতে নতুন একটা লাইন পেলাম। ঠিক করলাম, জঙ্গল থেকে ছিটকে এসে নায়কের একেবারে এই সভ্যতার চড়া আলোর মধ্যে পড়া, আর তার এই পরিবর্তন, এইটেকে আমি ধরব আমার গল্পে। কেননা নতুন কিছু দিতে না পারলে শুধুমাত্র যৌনজীবন ঘেঁটে ঘেঁটে লেখকদের আর চলবেনা। কেমন যেন বুঝতে পারছিলাম। এতে আপনাকেও চটানো হবেনা, আবার নতুনত্বও হবে। বেছে বেছে ঐ কৌশলটাই বের করলাম, যাতে সাপও মরে, লাঠিও ভাঙ্গে না।

করমুর বাড়ি গেলাম একদিন। অবশ্য আগের থেকে খবর দিয়েই। কোম্পানির কোয়ার্টার সে পায়নি। কারখানা তৈরীর সময় কণ্ট্রাকটাররা নিজেদের লোক থাকার জন্য যে আলোবাতাসহীন কতকগুলো ঝুপড়ি বানিয়েছিল, তারই একটা দখল করে থাকে সে। প্রতিবেশীরা অধিকাংশই দেশোয়ালী ভাই। হাসপাতালে জমাদারের কাজ করে বেশির ভাগ।

ইটের গাঁথনি টালির ছাত, গায়ে গায়ে লাগাও ঘুপচি ঘর, পিছন দিকে যে যতটুকু জায়গা পেয়েছ 'ক্ষেতিবারি' করেছে। সামনের মাঠটায় অপর্যাপ্ত শুকরের বিষ্ঠা, আনাচে কানাচে সঞ্চরমান সবৎসা মুরগী—বেশ বোঝা যায় জনহীন এই ডাঙাটায় প্রাণপণ চেষ্টায় এরা কারখানার বাড়তি সময়টাকে পাল্টে নিয়ে ফলিয়ে রেখেছে মাটিতে।

করমুর কাছে তো আমি লেখক না—তার ডিপার্টের 'চাজম্যান'। আমি তার হাজরি দিই, কাজ করতে বলি। মাঝে মধ্যে ওভারটাইমে রাখি, আর ভালো লোক বলে ওর মত 'গরীব আদমি'র বাড়িতে বেড়াতে আসি।

সুতরাং করমুর বাড়ির দাওয়ায় আমকাঠের চেয়ারে বসে, 'রসগুল্লা' খেয়ে বহুলোকের দৃষ্টির ভেতর দিয়ে যখন আমি রাস্তায় এসে পড়লাম, তখন গল্পের

মধ্যে আবার নতুন কতকগুলো জিনিষ এসে পড়ল। ভাবছিলাম, একটা গাছের ছাল ছাড়িয়ে আর একটা গাছে জুড়ে দিলে তেমন করে কি জোড়া লাগে! সুদূর ডালটনগঞ্জের পাহাড় আর ঝোড়ো বাতাস, পাগলাঝোরার বর্ষার জল পেয়ে ফুঁসে ওঠা কলরোল একদিন যে করমুর রক্তের মধ্যে ছিল আজ কেউ তা বিশ্বাস করবে? আদিম বুনো হিংস্রতাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে সেখানে কেমন শিকড় গেড়ে বসেছে এই কারখানা, এই আধাশহর, উঞ্ছবৃত্তি। গার্হস্থ্যে নিশ্চিন্ততায় ঝড় উঠলে করমু এখন বডজোর উঠোনের একপাশের কলাগাছটির মত মৃদু মৃদু মাথা নাড়ে।

কেন এমন হোল? মনে মনে আধুনিক সভ্যতাটাকেই কাঠগড়ায় দাঁড় করাই। মানুষের ভেতর থেকে সমস্ত তেজ মনুষ্যত্ব বীরত্ব সবকিছু কেড়েকুড়ে নিয়ে মানুষকে ছিবড়ে করে ফেলার ওস্তাদ এমনটি আর কে আছে। আমাদের চোখের সামনে এ ঝুলিয়ে রেখেছে নানান প্রলোভন—সিকিউরিটি, প্রতিপত্তি যশ সম্পদ। আমরা সবাই দৌড়চ্ছি—প্রতিযোগিতায় কারুর পা মাড়িয়ে দিচ্ছি, কনুই দিয়ে গুঁতো মেরে ফেলে দিচ্ছি মাটিতে। যেকোন উপায়ে প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারিয়ে এগিয়ে যাবার চেষ্টার আর বিরাম নাই আমাদের। যে কোন উপায়ে বেঁচে থাকাটাই হোল এ জগতে সবচেয়ে বড় কথা। স্ট্রাগল ফর এগজিসটেন্স। তার জন্যই চাই মানিয়ে নেবার ক্ষমতা—পাওয়ার অফ অ্যাডাপসান। মানিয়ে নিতে যে না পারবে তাকে সরে যেতে হবে এই দুনিয়া থেকে—এটাই নিয়ম। আর তো কোন রাস্তা দেখিনা। নিজের কথাটাই বা ভুলি কি করে?

যে বয়সে মানুষ খুব নীতিফিতিব কথা বলে রবীনদার সঙ্গে তখনই আমার আলাপ। অত্যন্ত স্মার্ট চেহারায় চোস্ত গলায় বলতেন, 'ওহে এই পৃথিবীটাকে ভীড় বোঝাই একটা ছোট বাসের মত ধরে নাওনা—গুঁতোগুতি করে ধাক্কাধাক্কি করে কোন রকমে উঠতে পারলে তো যাওয়া হোল, আর তা নয়তো রইলে পড়ে রাস্তায়। কেউ তোমাকে দয়া দেখাবে না, কেউ ডেকে বলবে না 'ওরে আয় আয়'—বরং দয়া করে কেউ যদি কথা বলে, বলবে, 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই ছোট এ তরী' হাঃ হাঃ হাঃ। এ নিয়ে রবীনদার সঙ্গে আমার তর্ক লাগত খুব। আমি বলতাম, ওঠাটাই সব নয়, ওঠার প্রসেসটাই বড় কথা। নিজের কাছে নিজেকে অন্তত ক্লিয়ার থাকতেই হবে।

তারপর অনেক বছর কেটে গেছে। আমারও বয়স বেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতা। আমার কলমের জোর আছে এটা অনেকেই বলেছিলেন। আমি

নিজেও যেন একটু একটু করে সে বিশ্বাসের স্তম্ভমূলে পা রাখছিলাম। তবু কিছুতেই যেন উঠতে পারছিলাম না এতদিন। অবশ্য উপরে ওঠার মানেটা আমি ইতিমধ্যে কখন রবীনদার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছি। সত্যের চেয়ে আমি বেশি করে খুঁজছিলাম সুনাম। বিখ্যাত পত্রিকায় লেখা ছাপার চেষ্টা করেও হচ্ছিল না। সুতরাং প্রকাশকের কাছে বই প্রকাশ করার কথা ছিল স্বপ্নের মত। কেমন যেন বুঝতে শুরু করে দিয়েছিলাম সবসময় নীতি আঁকড়ে থাকলে চলেনা। উপরে উঠতে গেলে এই বিরাট চক্রের ভিতর দিয়ে আমাকে পথ করে নিতে হবে। সোজা কথায় যাকে বলে এ্যাডজাস্টমেণ্ট, সেই এ্যাডজাস্টমেণ্ট আমাকে করতে হয়েছে জীবনে, সাহিত্যে। আমার উপর আপনার দাবী আমি মেনে নিয়েছি। আপনার পছন্দ মত করে নিজেকে আমি সাজিয়েছি প্রতিযোগিতায় সাফল্যের জন্য। আপনারা তখন আমার গল্প ছেপেছেন—পাবলিসিটি দিয়েছেন, টাকা দিয়েছেন। আমার বইটা সিনেমা করার ব্যাপারে সাহায্য করেছেন, আমিও ভাবতে শুরু করেছি নতুন করে জীবনটাকে বানাবো। আর একটু নিরাপত্তার গ্যারাণ্টি পেলেই আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে পুরোপুরি সাহিত্যসেবা করতে পারব। সেই গ্যারাণ্টি দেবেন আপনি—বিনিময়ে আমি দেব আমাকে—আমার আত্মাকে। আপনি তাকে নিয়ে একতাল কাদার মত আপনার ইচ্ছামত ভাঙবেন, গড়বেন আবার ভাঙবেন। আমি······

যাকগে, যা বলছিলাম। জগদীশের গল্পটা আমি আবার এই রকম ভাবে সাজালাম: ডালটনগঞ্জের প্রকৃতির সন্তান জগদীশ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শিকার হয়ে তার বৌ রুকমিনিকে নিয়ে গ্রাম ছাড়ল। দলে দলে লোকের সঙ্গে তারা যখন এসে পড়ল স্টেশনে, তখন পড়ল আড়কাঠির পাল্লায়। লোভ দেখিয়ে তাদের এনে তুলল ঝরিয়ার কয়লা খাদানে। দু'জনের কাজ মিলল সেখানে। জগদীশ কয়লা কাটে, রুকমিনি ওপরে রেলের ওয়াগনে কয়লা বোঝাই করে। সামান্য মাইনে, প্রচণ্ড খাটুনি। হপ্তায় যা পায় তার অর্ধেক চলে যায় আগের হপ্তার ধার শোধ করতে। তারপর আবার ধার। তবুও ছ'টি বছর তারা ছিল সেখানে। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটে গেল। ওয়াগন বোঝাইএর তদারক করে যে লোডিংবাবু সে ক্রমাগত কাছ ঘেঁসবার চেষ্টা করত রুকমিনির। একদিন একলা পেয়ে করে বসল একটা কাণ্ড। ব্যস্। জগদীশের কানে এল কথাটা, তুলে দিল রুকমিনিই। জগদীশের বুকের তলাকার বুনো রক্তটা উঠল লাফিয়ে। সেই রাত্রেই বিপত্নীক লোডিংবাবুর কোয়ার্টারে গিয়ে কয়লা-

কাটা গাঁইতার কয়েকটা ঘা বসিয়ে এসে সে বৌ আর ছেলেপুলেদের নিয়ে ছাড়ল ঝরিয়া। পৌছল দুর্গাপুর। সেখানে তখন অনেক কাজ—কারখানা গড়ে উঠছে, তৈরী হচ্ছে বাঁধ।

শুরু হোল জগদীশের আর এক জীবন। প্রথমে কনস্ট্রাকসন, পরে কারখানায় চাকরি পেল জগদীশ। রুকমিনি কাজ পেল হাসপাতালে। খাটুনি একটু কম, টাকা একটু বেশি। ছেলেপুলে বৌ কারখানা ওভারটাইম মুর্গি আর সবজীবাগান নিয়ে আস্তে আস্তে সভ্য হতে শুরু করল জগদীশ। আর তেমনি আনুপাতিক হারে কমে যেতে লাগল তার বন্যতা আর তেজ। কারখানায় এসে সে প্রথম শিখল অ্যাডজাস্টমেণ্ট। অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে পারল এখানে ভালোভাবে বাঁচতে গেলে মানিয়ে চলতেই হবে। কারণ, সবাই মানিয়ে চলছে। 'লিবার' মানিয়ে চলছে অফসরে'র সঙ্গে—'যুনিয়ন' মানিয়ে চলছে 'মানিজমেণ্টে'র সঙ্গে, খাতক মানিয়ে চলছে মহাজনের সঙ্গে। 'খুদ্দার' মানিয়ে চলছে 'দুকানদারে'র সঙ্গে। এখানে একজন আর একজনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে ব্যস্ত। জগদীশের জীবনে এটাই কারখানার সবচেয়ে বড় শিক্ষা। এটাই জগদীশের জীবনে সবচেয়ে বড পরিবর্তন।

গল্পটা লিখতে শুরু করে দিয়েছিলাম। আর মাথার মধ্যে গল্প যদি তৈরী থাকে তাহলে নামাতে আর কতক্ষণ! বস্তুতঃ খুব তাড়াতাড়িই লেখা চলছিল। নাইটশিফটে কাজ কম থাকে, লেখাও হয় বেশ। আশা করছিলাম আগামী সপ্তাহেই শেষ হয়ে যাবে গল্পটা। চিঠিও লিখে দিয়েছিলাম আপনাকে। গল্পের নাম দিয়েছিলাম 'সমঝোতা'। অ্যাডজাস্টমেণ্টের বাংলা ওটাই। সেই অনুযায়ী বিজ্ঞাপনও দিয়েছেন আপনি—আমি দেখেছি।

নাইট শিফটে ব্যাগে ভরে নিয়ে যাই কাগজপত্র। কাজকর্ম লোকজনদের বুঝিয়ে দিয়ে কণ্ট্রোল কেবিনের একটা নির্জন জায়গায় চলে যাই। কোন দরকার হলে করমু তো আছেই, ডেকে দেবে।

চারপাশের কণ্ট্রোল প্যানেলের হ্যামার কালার দেওয়া স্টীল শিটের দেওয়াল। ওপরে জ্বলছে টিউবল্যাম্প। মীলে অপারেশনের খটাটট শব্দ মাঝে মাঝে টিনের চালে ঢিল ফেলার মত ভেসে আসছে। মাঝে মাঝে অল্প অল্প কাঁপছে কেবিনটা। ব্লোয়ারের একটা গুরগুর শব্দ ভেসে আসছে তলা থেকে। এখানে বসে লিখতে লিখতে কখনো কখনো আমার মনে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ববোধ হয়। এখন তো অনেকে বিজ্ঞাপন দেয়—বিশ্বে প্রথম, অমুক

তমুক—অনেক গাঁজাখুরি! কিন্তু সত্যিই এভাবে কণ্ট্রোল কেবিনে বসে উপন্যাসেব জন্ম দেওয়া কেউ কখনো করেছে বলে আমার জানা নেই।

তলা থেকে একটা গোলমাল আসছে। মাসের বেতন পেলে লোকজনেরা এখানে একটা ফিস্টের আয়োজন করে—মাংসটাংস কিনে এনে এখানেই ফার্ণেসের আগুনে রান্না করে। এ তারই গোলমাল। ফূর্তির লহরা বইছে আর কি!

হঠাৎ ঝড়াং করে কেবিনের দরজা খুলে কে যেন ঢুকল। তারপর সম্ভবত আমাকে দেখতে না পেয়ে খুব উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকল, 'বাবু—ও বাবু!' কি ব্যাপার। মুহূর্তে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। এ্যাকসিডেন্ট নাকি কে জানে? খাতা কলম রেখে বাইরে এলাম।

—কি ব্যাপার! কি হয়েছে?

—বাবু আপনি তাড়াতাড়ি নিচে আসুন—তাডাতাড়ি, বলেই কভার অপারেটর তুকারাম দরজা খোলা রেখেই দৌড়ল। আমিও দ্রুত দৌড়ে নেমে গেলাম তার পিছু পিছু। গিয়ে দেখি এক অদ্ভুত ব্যাপার। একটা ফার্ণেসের মুখ হাট করে খোলা, আর করমু সর্বশক্তি দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে ক্রেন অপারেটর প্রসাদকে নিয়ে চলেছে সেই হাজার ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড গণগণে আগুনের দিকে। প্রসাদ চিৎকার করছে আর হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আছে নিচের রিফ্রাকটরি ব্রিকসের দেওয়ালের খাঁজ। বারবার ফস্কে যাচ্ছে তার হাতের আঙুল, আর ক্রমেই সে আগুনের কাছাকাছি চলে আসছে। করমুর মাথা থেকে কানের দু'পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ছে রক্ত।

তাড়াতাড়ি দু'জনকে ছাড়িয়ে তফাৎ করে দিলাম। তুকারামকে বললাম ফার্ণেস বন্ধ করতে। প্রসাদের সিটসিটে কালো শরীরটা তখনো কাঁপছে ভয়ে। তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে অনর্গল অশ্রাব্য খিস্তি। গুলি খাওয়া বাঘের মত থাবা উঁচিয়ে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে রক্তমাখা করমু, আর গজরাচ্ছে, 'তুমকো হম দেখেগা।'

ব্যাপারটা যা জানা গেল তা এই রকম: প্রসাদদের ফিস্ট চলছিল, হঠাৎ করমুও এসে ঐ ফিস্টে যোগ দিতে চায়। প্রসাদ তাকে ঠাট্টা করে, 'ফিস্ট করবি তো টাকা নিয়ে আয়—তুই শালা ভাত খেতে পাসনা, তোর অত ফিস্টের শখ কেন?' তারপর এই নিয়ে দু'কথা চারকথা হতে হতে ব্যাপারটা আরো গড়ায়—কথায় কথা বাড়ে। করমু প্রসাদকে সুদখোর বলে গাল দেয় আর প্রসাদ হঠাৎ ফস্ করে বলে বসে, 'হ্যাঁরে শালা, এই সুদখোরের দেনা শোধ

করতে না পারলে তুই তোর বৌকে বেচে দিস্ আমাকে।' ব্যস, আর যায় কোথায়। কথা কাটাকাটি, তারপর মারামারির পর্যায়ে চলে যায়। করমু প্রসাদকে বসিয়ে দেয় এক ঘুসি—আব প্রসাদ পাশে পড়ে থাকা একটা রড তুলে নিয়ে বসিয়ে দেয় করমুর মাথায়। করমু মার খেয়ে প্রসাদকে এসে জাপটে ধরে। তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তিটা তো আমি নিজের চোখেই দেখেছি।

অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে করমুকে ওপরে নিয়ে এলাম। তখনও গজরাচ্ছে সে। যেন প্রসাদকে পেলে কাঁচাই চিবিয়ে খায়। তার এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতার জন্য তাকেই বকি, 'দেখতো, আর একটু হলেই কি বিপদটাই না হয়ে যেত!' করমু চুপ। মাথা নিচু করে সে বসে আছে। কৃতকর্মের জন্য কোন অনুশোচনা হচ্ছে বলে তো মনে হয় না। অতি দ্রুত তার মুখের রং আর কপালের রেখায় জ্যামিতিক পরিবর্তন দেখে বুঝছিলাম ভেতরে ভেতরে সে তখনও দগ্ধ হচ্ছে। আর তারপর হঠাৎই যেন আগ্নেয়গিরির মত ফেটে পড়ল করমু, 'ক্যা হোতা? নোকরি ছুট যাতা? জেহেল হোতা? ফাঁসি হোতা?' কটমট করে এমন-ভাবে তাকিয়ে রইল যেন আমিই তার প্রতিপক্ষ! অথচ নোকরিই যাক, আর জেল বা ফাঁসিই হোক, এর কোনটাই তার পক্ষে সুখের হোত না।

রেগে বললাম, 'তোমার বৌ, তোমার বালবাচ্চা না খেয়ে মরত আর কি হোত!

করমু যেন আমার কথা শুনতেই পেল না। আপন মনেই গজবাতে লাগল নিজের দেহাতী ভাষায়। বিশেষ কিছু বুঝলাম না। শুধু 'ইজ্জৎ' কথাটা কয়েকবার কানে গেল।

করমুকে হাসপাতালে পাঠিয়ে একটা রিপোর্ট লিখে দিয়ে আবার ফিরে এলাম লেখার জায়গায়। চারপাশে ছড়ানো কাগজ। খোলা কলম কাগজের উপর আরবী ঘোড়ার মত ছোটার জন্য যেন কেশর ফুলিয়ে তৈরী হয়ে আছে। আমার মাথাব মধ্যে করমু, জগদীশ, ইজ্জৎ, রুকমিনি এইসব কথাগুলো জড়িয়ে এমন ভারি হয়ে আছে যে ফার্ণেসের সামনে একটু আগে ঘটা নাটকটাই আমাব মন জুড়ে বসে আছে।

এত কিসের রাগ করমুর! প্রসাদ তার বৌকে বিক্রী করে দেবার কথা বলেছিল বলেই কি? কিন্তু ওদের সমাজে এটা আর এমন কি ব্যাপার! বিবাহিত বৌকে ছেড়ে দেওয়া বা অন্যের বৌকে নিয়ে ঘর করা, এতো ওদের সমাজে প্রচলিত ঘটনা। তবে কি করমু ওর বৌকে খুবই ভালোবাসে? যার জন্যে স্ত্রীর সম্পর্কে এই শ্লেষ ওকে এত উত্তেজিত করেছে? ওর বাড়িতে গিয়ে

ওর বৌকেও দেখেছি। নিতান্ত সাধারণ একটি পশ্চিমা মহিলা। ভালোবাসা থাকতে পারে, কিন্তু করমুর ব্যবহারে তেমন বাড়াবাড়ি তো কিছু দেখিনি।

ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে দিল তুকারাম। ব্যাপারটা নিয়ে করমুর এটা একটু বাড়াবাড়ি সন্দেহ নেই তবু আওরতকে ঘিরে এই ধরনের কথাকে ওরা সর্বাপেক্ষা সম্মানহানির ব্যাপার বলে মনে করে। হ্যাঁ, এটা ঠিক বটে, তুকারামও স্বীকার করে, বৌ নষ্টচরিত্র হতে পারে, ছেড়ে চলে গিয়ে অন্যকে নিয়ে ঘর করতে পারে, তবু বৌ বৌ-ই। বাইরের কেউ বৌকে অপমান করা মানেই ইজ্জতের উপর সব থেকে কঠিন আঘাত দেওয়া। আর ইজ্জতই যদি চোট খেল, তবে আর মানুষের বাঁচার দরকারটা কি?

শুনতে শুনতে আমার রোমাঞ্চ হচ্ছিল। করমুর মুখটা মনে পড়ছিল। রাগে পোড়া ব্রোঞ্জের মত মুখ। ধীরে ধীরে সে মুখটা বড় হতে হতে আমার উপর কালো ছায়া ফেলছিল। মেকি আধুনিক সভ্যতার চোয়ালের বাইরে আমি যেন তার শরীরে শানানো পাথরের কুঠার হাতে তার পূর্বপুরুষের ছবি লক্ষ্য করছিলাম। তারপর থেকেই করমুর সামনে নিজেকে আমার খুব ছোট মনে হচ্ছে। বহুদিন পর আপনার কাছে বিক্রী করে দেওয়া আমার ইজ্জতের ছোট ছোট সেই খণ্ডগুলির জন্য আমার শোক হচ্ছে। হ্যাঁ, ইজ্জত বই কি? সবকিছু ছেড়ে সাহিত্যেই যখন প্রাণমন নিবেদন করেছি তখন একে ঘিরেই তো আমার ইজ্জৎ। আমার সে গোপন অন্দর মহলে সেখানে কোন অদৃশ্য লুণ্ঠনকারী হাতের উপস্থিতি আমি আর সহ্য করব না। মাকড়সা যেমন পোকামাকড়ের শরীরের রক্ত চোষে, তেমনি আপনিও আমাকে সস্তা যশ আর অর্থের লোভ দেখিয়ে আমার মণিকোটরগুলোতে ঢোকার রাস্তা করে নিয়েছেন। এ আর আমি সহ্য করব না।

হ্যাঁ, করমুকে নিয়ে আমি গল্প লিখব। জগদীশের গল্প নয়। করমুর গল্প হবে সেটা। যদি ছাপতে চান, আমি আপত্তি করব না। জগদীশের গল্প আমি ছিঁড়ে ফেলে দিয়েছি। []

গিরিবালার মায়ের দয়া হয়েছিল—এখন সবে ক'দিন হোল সেরেছে। তেমন কিছু নয় অবশ্য, সামান্য মুখে হাতে দু'একটা ছিটকা ছাটকা দাগ ছাড়া বিশেষ আর কোন চিহ্ন নাই।

নীলমাধব দশদিন ঠায়ঠিয়স্তা ঘরে বসে ছিল। এই দৌড়ে যায় দৈবকের ঘর, এই আবার উনান জেলে মুসুরির ডাল তোয়ের করে, কানি কাঁথা কাচে। আর সময় পেলেই গিরিবালার বিছানার পাশটিতে বসে গিরিবালার গায়ে নিম পাতার সুড়সুড়ি দেয়। দিনকতক গিরিবালার গা হাতে বেদনাও ছিল খুব—চোখ তুলে চাইতে তক পারেনি। কিন্তু কদিনেই সে অবস্থাটা কাটিয়ে উঠল গিরিবালা। নীলমাধব না থাকলে গুট গুট করে সে বিছানার বাইরে আসে, বাটি থেকে নিজের হাতে তুলে তুলে কুটুর কাটুর মুড়ি চিবোয়। নীলমাধব দেখতে পেলেই প্রচণ্ড বকুনি লাগায়, 'চান যায় নাই এখনো, আর এত বাহাদুরীর তোর কী দরকার য়্যাঁ! যা শুগা যা বেছনায়।' গিরিবালা আবার ভয়ে ভয়ে বিছানায় যেয়ে শুয়ে পড়ে।

কিন্তু তারও তো খারাপ লাগে। মরদ মানুষ কাঁথাকানি কাচবে, রান্না-বান্না করবে আর সে শুয়ে শুয়ে খাবে এটা তার ভাবতেও কেমন লাগে। তাছাড়া লোকটারও তো এখন কাজের সময়; বিঘা তিনেক যা জমিজমা আছে, সার নামান, হাল দেওয়া কত রকমের কাজ। তা না হ'লে শুধু বৌ আগলে পড়ে থাকলেই তো চলবে না। একদিন নীলমাধব গেছে দৈবকের কাছে, গিরিবালা করেছে কি, কাপড় চোপড় যা ছিল কেচেছে নিজেই। তারপর উঠোনে টাঙানো তারে মেলে মেলে দিচ্ছে সব শুকোতে, আর এমন সময় নীলমাধবের হঠাৎ আবির্ভাব।

'বলি ইটা কি হচ্ছ্যা য়্যাঁ?' এক লহমা থম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে নীলমাধব তারপর গট গট করে এগিয়ে এসে একটানে তার থেকে সব কটা কাপড় মাটিতে ফেলে দেয়। গিরিবালা আগেই দৌড় দিয়ে ঢুকেছে বিছানায়। আর তারপর নীলমাধবের সেকি গালাগালি—

'দূর দূর, দূর হয়ে যা ঘর থেকে—বেহায়া চুয়াড় মেয়্যামানুষ কুথাকার। আমি শালা ট্যাকা খরচা করে মচ্চি—আর তোর শালি একটা আক্কেল গেরাহ্যি তক নাই, য়্যাঁ'—নীলমাধব হাতের ওষুধটা ঢেলে দেয়। দাওয়ায় উনুনে টগবগ করে ফুটছিল ভাত, দৌড়ে যেয়ে হাঁড়িটা তুলে ছুঁড়ে দেয় উঠোনে। তারপর, 'মর শালী তুই শুকিয়ে শুকিয়ে' বলতে বলতে বেরিয়ে যায়।

এই রকম পাগল নীলমাধব। গিরিবালাকে কত সাবধানে যে কথা বলতে হয় তার ঠিক নেই। কত কষ্টে বুঝিয়ে সুঝিয়ে বলাব পর আজ পনের দিন পর নীলমাধব বেরোলো কাজে।

দুপুরে গিরিবালার দাদা হঠাৎ এসে হাজির, ব্যাগে ফলমূল মিষ্টি আর হাতে দড়ি বাঁধা দুটো ভাব নিয়ে। গিরিবালা আনন্দে উপচে ওঠে।

'তুমি কবে আল্যে দাদা দুর্গাপুর থাক্যে?'

'আমি তো কালকেই এসেছি বাড়ীতে—তাবপর তোব খবর শুনে তা কেমন আছিস এখন?'

'ভালোই আছি অখন, তবে একটুকুন কাহিল কাহিল লাগে'।

'ভালো করে খাওয়া দাওয়া কর—দুধ, ডিম এইসব। আর হ্যাঁ, এই ভাবগুলো রাখ—ডাবের জল মাখলে পক্সের দাগ সারে।' বিছানার উপর ধপ করে বসে পড়ে টেরিলিনের জামাটা খুলে ফেলে দাদা। ঘামে তার গেঞ্জি ভিজে গেছে। গিরিবালা খুঁজে পেতে একটা তালপাতার পাখা এনে দাদার হাতে দেয়।

উনুনে ডাল ফুটছে টগবগ করে। গিরিবালা উনুনের পাশে বসে বসে আরো কয়েকটা শুকনো তালবেকড়ো ঢুকিয়ে দেয় নিবে আসা আগুনে। তারপর তরকারীর চুপড়িটার দিকে নজর করে। দু'তিনটে শুধু আলু পড়ে আছে। সারকুড়ে অবশ্য একখানা পুনকা শাক আছে। পোস্তও আছে অল্প। কিন্তু একটু মাছ ডিম! এত বেলায় এই গ্রামদেশে কোথায় আর মাছ পাওয়া যাবে। আর ডিম! কজনের ঘরে হাঁসটাস আছে বটে কিন্তু ডিম পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। রোজ সকালে বিকালে পাইকার এসে নগদ দাম দিয়ে ডিম কিনে নিয়ে চলে যায়, শহরে চালান যায় সেসব। গিরিবালা বড় অপ্রস্তুত হয়।

তার দাদা যেমন তেমন লোক নয়—দুর্গাপুরে কাজ করে, তিন চারশো টাকা নাকি মাইনে পায়। শুধু আলু পোস্ত আর ডাল দিয়ে ভাতের থালাটা কি করে আগিয়ে দেবে তার সামনে ?

'গিরি, একটু চা কর দেখি,' দাদার ডাকে চমক ভাঙে গিরিবালার।

'এই যাই, জল খাবে তো আগে ?'

'দে তবে। হ্যাঁরে নীলমাধব কোথায় ?'

'সে একটু বেরাইছে কাজে।'

গিরিবালা কেঠো বাটা হাতড়ে বেড়ায়। সামান্য একটু চা পড়ে আছে তলায়—কিন্তু চিনি! গিরিবালার মনে পড়ল কতদিন তারা চিনির মুখ দেখেনি। দোকানে কী একটা পুজোর সময় একবার নিয়ে এসেছিল নীলমাধব—চারটাকা সাড়ে চারটাকা নাকি কেজি! হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ে যায় তার। খানিকটা মিছরি তো আছে। অসুখের সময় নিয়ে এসেছিল নীলমাধব—তারই থেকে একটু বেঁচেছে।

বাইরে প্রচণ্ড রোদ। এরই মধ্যে বেশ গরম ধুলোর ঝড় বইছে। নীলমাধব সেই কোন সকালে বেরিয়েছে—ফেরার নাম নেই এখনো। খড়ের চাল বলে ঘরের ভেতরটা একটু ঠাণ্ডা। চা খেয়ে গিরিবালার দাদা ঘুমিয়ে পড়েছে বিছানায়। একটিই ঘর। সামনে দাওয়া। দাওয়ার দু'পাশটা বুক সমান মাটির দেওয়াল দিয়ে ঢাকা। তারই একদিকটায় উনুন। উনুনের পাশে শুকনো কাঠকুটো। আর একটা পাশে একটা নারকেল দড়ি টাঙানো। সেখানে ঝুলছে শাড়ি, লুঙ্গি, জামা। ঘরের মধ্যে ছোট একটি চাল পুড়া। এবছর ধান হয়নি একেবারে। পোকায় সব ধান খেয়ে আগড়া করে দিয়েছে। মাস ছয়েক হয়তো যাবে যা চাল আছে—তারপর কি হবে ভগবান জানেন। গিরিবালার মনে পড়ল দাদা বলছিল ডিম খেতে, দুধ খেতে। দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল তার। দাদা বুঝি ভাবে তারা বড়লোক!

গিরিবালা তাড়াতাড়ি ঘর গুছোনোতে হাত লাগায়। জামা, কাপড় পাট করে রাখে দড়িতে। ঝাঁট পাট দেয়। দাদার আনা জিনিসপত্তর থলি থেকে বার করে রাখে। ডাব দুটো কি সুন্দর। কচি সবুজ সতেজ ডাব। নিশ্চয়ই অনেক দাম। দাদা তাকে কতো ভালবাসে। তাই না বাড়ীতে এসেই তাকে

দেখতে এসেছে। মায়ের দয়ার পর ডাব খাওয়া নাকি ভালো, পেট ঠাণ্ডা রাখে। গা জ্বালা কমায়। ডাবের জল মাখলে দাগ টাগ নাকি সারে। দু'চারটে তো মোটে দাগ। সামান্য একটুকুন মাখলেই চলবে—বাকিটা খাওয়া যাবে। গিরিবালা ডাব দুটোর ঠাণ্ডা সবুজ শরীর গালের উপর চেপে ধরে।

বাইরে নীলমাধবের গলার শব্দ পাওয়া যায়। বিরাট একটা শুকনো তাল-বেকড়োর বোঝা মাথায়, কাঁধে হেঁসোবাঁধা লম্বা বাঁশের আঁসকি নিয়ে ঢুকল সে। গিরিবালা তাড়াতাড়ি বাইরে এসে হাতের ইশারায় ডাকল তাকে। ধপাস্ করে বোঝাটা মাটিতে ফেলে আঁসকিটা রেখে গামছা দিয়ে ঘাম মুছতে মুছতে নীলমাধব কাছে এল। কর্কশ গলায় বলল, 'কী হোল আবার?'

'একটুকু আস্তে, দাদা আইচে।'

'অ, তা কী ব্যাপার? গরীব বুনের ঘর—এমন হঠাৎ করে?'

'দেখতে আইচে আমাকে। তুমি বাপু ছেঁড়া কাপড়টা ছাড়ো। ঐ লুঙ্গিটা পর।'

'কেনে?' চোখ লাল করে তাকায় নীলমাধব, 'বড়লোক দাদার কাছে লজ্জা লাগছে?'

গিরিবালা চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে মুখ নীচু করে।

নীলমাধব তাচ্ছিল্যভরে আবার বলে, 'তোর বাপ আমার সাইকেলটা এখনো তক দিকে লারল্যাক—তার আবার বড়লোকি ভাব।'

গিরিবালার বাবার জামাইকে একটা সাইকেল দেবার কথা—এখনো দিয়ে উঠতে পারেনি, তাই এই খোঁচা।

গিরিবালার সারা শরীর অসহায় রাগে চিড়বিড় করে ওঠে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না ভয়ে। এখুনি হয়তো কুরুক্ষেত্তর কাণ্ড একটা বেঁধে যাবে তাহলে। গিরিবালা নিঃশব্দে সরে যায় সামনে থেকে। পাখাটা এনে দেয়। তারপর একটা রেকাবীতে করে দাদার আনা মিষ্টি আর এক গ্লাস জল নামিয়ে দেয় সামনে।

বাইরে ঝাঁ ঝাঁ কাঠ ফাটা রোদ। ছোট ছোট ভেড়ুল শুকনো পাতা আর খড়কুটো নিয়ে ছুটছে ঘুরতে ঘুরতে। নীলমাধব উঠোনে নেমে এসে খাবার জলটা দিয়েই সশব্দে কুলকুচো করে—ঘাড়ে মাথায় নেয়। হাতের তেলোয় জল নিয়ে তাতে নাক ডুবিয়ে ঘড়ঘড় শব্দে নাক দিয়ে জল টানে।

নাক থেকে বেরিয়ে আসে লালচে লালচে রক্ত ধোয়া জল। গিরিবালাও দেখতে পায়, জিজ্ঞেস করে,

'কী হল, রক্ত কেনে ?'

'শরীর কষে গেছে আর কি। হাঁ করো দেখছিস কি, তা আর একঘটি জল তা।'

গিরিবালা আর একঘটি জল এনে দেয়। গরমকাল এলেই নীলমাধবের এই এক রোগ। কোথাও কিছু নেই হঠাৎ নাক দিয়ে গলগল করে রক্ত পড়ে। টানের ধাত। রোদে ঘোরাঘুরি করলে বাড়ে।

নীলমাধব ধাতস্থ হয়ে আবার দাওয়ায় এসে ঠেস দিয়ে বসে। গিরিবালা মাথায় বাতাস করে।

'একটুক সরবৎ তোয়ের কর দেখি' নীলমাধব বলে।

'সরবৎ ?' বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে থাকে গিরিবালা।

'হুঁ, হুঁ সরবৎ—কলজাতে একটা কেঠোয় মিছরি রেখেছিলাম, আছে দেখ। একটুক সরবৎনা খেলে ই শালার টান কাটব্যেক নাই।'

যন্ত্রচালিতের মত গিরিবালা ঘরে ঢোকে। মিছরিটুকু কোথায় ছিল তা তার অজানা নেই। খানিক আগে দাদাকে চা তৈরী করে দিয়েছে তাই দিয়ে, কি হবে এখন। এমন দুশ্চিন্তায় আর কখনো পড়েনি সে। সম্ভব অসম্ভব নানা চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খেতে লাগল। একবার ভাবল চট করে কারুর বাড়ী থেকে দেখি যদি ধার পাওয়া যায়। তারপর মনে হোল কার বাড়ী বা যাবে। সবায়ের অবস্থা তো তারই মত, পাঁচ ছ'টাকা কেজির মিছরি কে আর তার জন্য জমিয়ে রেখেছে। একবার মনে হোল চাট্টি চাল আঁচলে বেঁধে দোকানে চলে যাই—নিজেই মিছরি কিনে আনি। কিন্তু দরজার সামনেই বাঘের মত বসে আছে স্বয়ং নীলমাধব। চাল বিক্রী করতে যাচ্ছে জানতে পারলে দাদার সামনেই হয়তো পিটতে শুরু করে দেবে তাকে। গিরিবালা আকুল হয়ে ঠাকুরকে ডাকতে লাগল। হঠাৎ তার চোখে পড়ে গেল সবুজ ঠাণ্ডা কচি দুটী ডাব। এই প্রচণ্ড বিপদে যেন তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার জন্যই তারা এসেছে। গিরিবালা নিঃশব্দে বঁটি দিয়ে একটা ডাবের মুখ কেটে জলটা গ্লাসে ঢালল।

ভারী ভালো লাগছিল গিরিবালার! খুব সময় মতো বুদ্ধিটা এসেছিল যাহোক। ডাবের জলও ঠাণ্ডা। নীলমাধব খুশী হবে নিশ্চয়। পরে মেজাজ ভালো হলে বলবে একদিন, 'দাদা আইছিল বলেই না তারিয়ে তারিয়ে ডাবের জলটি খাল্যে।'

নীলমাধব হাঁক দিল, 'কই তোর হোল?'

'এই লাও' গ্লাসটা এগিয়ে দিল গিরিবালা।

নীলমাধব চুমুক দিতে যেয়ে একটু থমকে দাঁড়াল, 'এমন ঘোলা ঘোলা কেনে?'

'নেবু দিইচি', কথাটা ভাঙতে না পেরে হুম করে মিথ্যে বলে দেয় গিরিবালা। এক চুমুক দিয়েই হাতটা স্প্রিংয়ের মত টেনে আনে নীলমাধব।

'বলি ইটা কি, এ হারামজাদী? ইটা কি? আমাকে বশ করার ওষুধ?' বলতে বলতে গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মুখের জলটা ফেলে দেয় থুঃ থুঃ করে। গিরিবালা আর সামলাতে পারে না নিজেকে। হু হু করে কেঁদে ফেলে মুখে কাপড় গুঁজে। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলে, 'দাদা ডাব লিয়ে আইছিল, তারই কাট্যে দিয়েছিলাম একটা।'

নীলমাধব অপ্রস্তুত হয়। তবু হারবার পাত্র নয় সে। বলে 'কেনে মিছরি কুথায়? সরবৎ তুই করলি নাই কেনে—বল?'

'চিনি ছিল নাই—তাই মিছরি দিয়ে চা কর্যে দিইচি দাদাকে।'

'অ, তাই বল,' ভয়ানক মুখ খিঁচিয়ে উঠে নীলমাধব, 'তাই বলি এত পীরিত কেনে......।'

ঘরের ভেতর ঘুমভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করে দাদা: 'কী হোল রে গিরি? নীলমাধব এসেছে?' বলতে বলতে উঠে আসে।

গিরি একহাতে চোখের জল মুছে প্রাণপণ চেষ্টায় মুখে হাসি ফুটিয়ে বলে, 'সব ডাবের জলটা পোড়ার মুখো উ টাই দিলেক গা', বলে পাঁচিলের উপর বসা একটা ঘুমনো বিড়ালকে দেখিয়ে দিল। []